তোমার দেওয়া অঙ্গুরীয়

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৭২

ক্মার শীল কর্ত্তৃক ৬, কামার পাড়া লেন, বরাহনগর হইতে প্রকাশিত
কণীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অবলা প্রেস ১।এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

এই লেখকের লেখা—

জাগ্রত যৌবন, তুহু মম জীবন, চিতা বহ্নিমান, প্রিয়া ও পৃথিবী,
জ্যোতির্গময়, মধুরাতি জাগরা, হৃদয় দিয়ে হৃদি,
সন্ধ্যারাগ, আকাশ বনানী জাগে,
জলে জাগে ঢেউ, প্রজাপৎ ঋষি,
ফাল্গুনি মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ
গল্প সঞ্চয়ন প্রভৃতি।

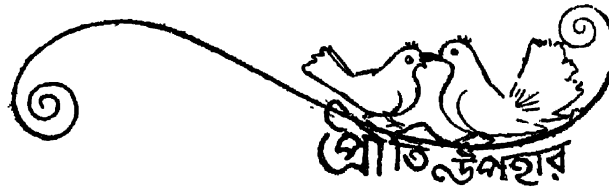
প্রীতি উপহার

তোমার দেওয়া অঙ্গুরীয়

রেল লাইন হইতে দেখা যায়—ঐ যে সরু রাস্তাটি ধান ক্ষেতের আলের উপর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া দূর নারিকেল কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে, ঐ গ্রামটিই শ্যামলপুর।

নামটি শুনিয়া হয়ত গ্রামটিকেও বড় সুন্দর ঠাওরাইয়াছেন? তা—হ্যাঁ, বছর পঞ্চাশ পূর্বে গ্রামখানি সুন্দরই ছিল। ভট্টাচার্যদের টোলে তখন প্রায় চল্লিশ জন ছাত্র পড়িত; প্রভাত হইবার পূর্ব হইতে তাহাদের স্তোত্রপাঠ আপনাকে ঋষিদের যুগে লইয়া যাইত, আর কি! তার পর ছিলেন স্বয়ং দিনদেব ভট্টাচার্য মহাশয়, যুবা পুরুষ,—সুগৌর তনুখানি তাঁহার দেখিবামাত্র আপনার ভ্রম হইত,—দুষ্মন্তের রাজ্যেই আসিয়াছেন বা!

শকুন্তলা? হ্যাঁ, তিনিও ছিলেন, ঐ ভট্টাচার্যের পত্নী উষাসতী। কোন্ কণ্বের আশ্রম-তরুমূলে তিনি জলসেচন করিতেন তাহা নাই বা শুনিলেন! তবে এই রাজ্যে তাঁহাকে সকলে দেখিয়াছে রাণীর আসনে, আবার দেখিয়াছে মর্ত্যধূলিতে ভিখারিণী অপেক্ষাও ম্লান।

আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন, আমি একটা ঐতিহাসিক ঘটনার কথা ফাঁকি দিয়া আপনাদের শুনাইতেছি—না, সেরূপ দুরভিসন্ধি আমার নাই। আমি ঐ শ্যামলপুর গ্রামের দিনদেব ভট্টাচার্যের কথা বা তাহার প্রাণাধিকা পত্নী উষাসতী দেবীর কথা বলিতে বসি নাই। যাহা বলিতেছি, তাহা আপনি ইচ্ছা করিলে শুনিতে পারেন—তবে বলিয়া রাখি যে ইহা কোন ঐতিহাসিক কাহিনী নয়।

ঐ যে, ঐ পুকুরটা দেখিতেছেন না, ঘন-সারি নারিকেল পুকুর, যার মাথায় চাঁদটা উঁকি দিতেছে, ঐ পুকুরটার নাম শ্যামলপুর। শ্যামলপুরের শ্যামলপুকুর। দিনদেব ভট্টাচার্যের পিতামহ ভট্টাচার্যের হাতে-গড়া ঐ পুকুর। আর ঐ পুকুরে দিনদেব তাঁর মাতা

। ।৩। গণদেব ভট্টাচার্য স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন নারিকেল বৃক্ষ; বসাইয়াছিলেন টোল ঐ পুকুরের দক্ষিণদিকে। টোলের ছাত্রগণ অতি প্রভাতে উঠিয়া তখন দেব-বন্দনার সংগে সংগে গণদেবের বন্দনা গান করিত। গণদেব বেশিদিন পৃথিবীতে থাকিতে পাইলেন না। দিনদেব তখন মাত্র ষোল বৎসরের বালক। কিন্তু বালক হইলে কি হইবে, ভীষ্মদেবের পৌত্র, গণদেবের পুত্র দিনদেব—তিনি কি কোন কার্যে পশ্চাৎপদ হইতে জানেন? তিনি ঐ বৃহৎ গ্রামের শাসনদণ্ড পিতার মৃত্যুর পরদিনই তুলিয়া লইলেন স্বহস্তে। কিন্তু থাক, রাজা জমিদারের কথায় আমাদের কি-ই বা প্রয়োজন!

শ্যামলপুকুরের পূর্বদিকে যে ছোট গ্রামখানি, মাত্র কয়েকটা ঘর বসতি, উহার নাম রূপসীপুর। ঐ গ্রামের বধূগণ শ্যামলপুকুরের পানীয় জল আহরণে আসে, রূপসীপুরে আর ভাল পুকুর নাই বলিয়া। পাশাপাশি দুটি গ্রামের ঐ পুকুরটি যেন যোজক। কিন্তু সে কথাও না-হয় থাক!

ঐ যে টোলের কথা বলিয়াছি, ঐ টোলেরই একটি ছাত্র তখন মাত্র কাব্য পাঠ আরম্ভ করিয়াছে; উদাত্ত শ্লোকগাথা তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠ হইতে অনর্গল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে প্রতি-প্রভাতে। পুকুরের দক্ষিণদিকের ঘাটে যে বিশাল বকুলবৃক্ষটা, উহার তলায় বসিয়া সে তাহার প্রভাতের পাঠ অভ্যাস করে।

সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে কি আছে বলিতে পারেন? মানুষকে যেন উহা কোন্ অননুভূত, অনাস্বাদিত, অবাস্তব রাজ্যে লইয়া যায়। ছাত্রটি কবি—কাব্য পাঠের সময় তাহার জানা থাকিত না যে পূর্ব দিকের ঘাটে একটি বালিকা শিবপূজা করিতে করিতে মন্ত্র ভুলিয়া যাইতেছে। শিবপূজার মন্ত্রও অবশ্য কাব্যময়, কিন্তু ছাত্রটির উচ্চারণের শক্তি তো আর বালিকার ছিল না—কাজেই যাহা হইবার—মেয়েটি রোজই পূজায় ভুল করিত। হয়ত ধ্যানের আগেই পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিত কিংবা প্রণাম-মন্ত্রের সাথে সাথে ছাত্রটির আবৃত্তিকরা সেই কাব্যের বাণী বলিয়া ফেলিত। নিত্য এইরূপ ভুল

হওয়ায় অতিষ্ঠ হইয়া একদিন মেয়েটি তার পিতার নিকট নালিশ করিল যে, কে একজন পুকুরঘাটে উচ্চৈঃস্বরে কাব্য পাঠ করায় তাহার পূজার ব্যাঘাত হইতেছে। পিতা কন্যাকে জানাইলেন যে, তাহার পূজার ব্যাঘাত হইতে দেওয়া যেমন উচিৎ নয়, ঐ ছাত্রটির পড়ার ব্যাঘাত হইতে দেওয়াও তেমনি অনুচিত।

মেয়েটি আর কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু ঐ কাব্য-পাঠক কে, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইল—অথচ জানিবার কোনই উপায় বাহির করিতে পারিল না।

ধীরে ধীরে মেয়েটি ঐ ছাত্রটির আশ্চর্য কণ্ঠস্বরে কেমন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। প্রতি প্রভাতে শিবপূজার সময় সেই কণ্ঠস্বর না শুনিলে তাহার আর পূজাই হইত না। সে যেন তখন হইতে মনের অজ্ঞাতে শিবপূজায় মধ্যে সেই কণ্ঠস্বরকেই পূজা করিতেছিল। কোনদিন কোন কারণে ছাত্রটি অনুপস্থিত হইলে মেয়েটিও তাড়াতাড়ি কোনরূপে পূজা সারিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত। সাপুড়িয়ার বাঁশী যেমন সর্পকে আকর্ষণ করিয়া স্থির করিয়া রাখে, ঠিক তেমনি ঐ ছাত্রটির কণ্ঠস্বর মেয়েটিকে ধরিয়া রাখিত পুকুরঘাটে। ঘাটের বাঁধান পাথরে বসিয়া সে স্তব্ধ হইয়া শুনিত ছাত্রটির স্তোত্র পাঠ। সে-সময়ে একটা কোকিল ডাকিলেও মেয়েটির বিরক্ত বোধ হইত। বেলা বাড়িবার সংগে সংগে ঘাটে অন্য লোক আসিত কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ছাত্রটির পাঠ শেষ হইয়া যাইত এবং সে চলিয়া যাইত। এ ঘাটেও মেয়েটি তাহার পূজার সরঞ্জামগুলি গুছাইয়া বাড়ি ফিরিত।

এমনি করিয়া দিন বেশ কাটিতেছিল, কিন্তু মেয়েটি বড় হইয়া উঠিল এবং তাহার পিতা তাহাকে পাত্রস্থ করিতে সচেষ্ট হইলেন। ভয়ে এবং ভাবনায় মেয়েটির বুকের রক্ত শুকাইয়া উঠিল। তাহার আবাল্যের পরিচিত তপোবনভূমি, তাহার শিবপূজার তীর্থ শ্যামল-পুকুর, তাহার মর্তের স্বর্গ, বকুল-তরুতল এবং তাহার স্বর্গের ইন্দ্র ঐ পাঠরত ছাত্রটি, ইহাদের ছাড়িয়া সে যাইবে কোথায়! মেয়েটি গোপনে এত কাঁদিল যে কান্না আর গোপন রহিল না। তাহার মাতা

তাহাকে একাদন ধারয়া ফেলিলেন এবং সবিস্ময়ে জানিলেন যে, মেয়েটির বিবাহের দারুণ অনিচ্ছা। কিন্তু তখন তো আর ভদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে চিরজীবন কুমারী মেয়ে রাখা চলিত না, তাই মেয়েটির সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া পিতামাতা তাহার বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন।

মেয়েটির বিবাহ ঠিক হইয়া গেল—কিন্তু কাহার সংগে তাহা জানিবার জন্য তাহার এতটুকু আগ্রহ দেখা গেল না। এই বিবাহ যে তাহাকে তাহার কুমারী-জীবনের আনন্দ হইতে বহু দূরে লইয়া যাইবে, ইহাই যেন সে প্রাণ-মন দিয়া অনুভব করিতে লাগিল; তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল, এই বিবাহের অর্থ তাহার পূজারিণী জীবনের মৃত্যু।

কিন্তু এমন করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে তাহার পূজারিণী মন রাজি হইল না। সে-মন তাহাকে শাসাইয়া বলিল—তুমি একদিন যাঁহার কণ্ঠস্বরের পূজা করিয়াছ—তাঁহাকে একবার চোখের দেখা দেখিয়া কি তোমার কুমারী-জীবনের শেষ প্রণতিটিও জানাইয়া যাইবে না। যদি তাঁহার সম্মুখে যাইতে তোমার একান্ত বাধা থাকে তবে অন্ততঃ প্রত্যহ যে-স্থানে তিনি উপবেশন করেন, সেই স্থানের মৃত্তিকায় একবার তোমার মস্তক লুণ্ঠিত কর—তোমার ভাবী জীবনের পথে তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে।

দুর্বলতা আছে বলিয়াই তো আজো মানুষ ঠিক মানুষই আছে। মেয়েটি এতদিন যাহার কণ্ঠস্বরকে পূজা করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহার কুমারী-জীবনের শেষদিনে একবার তাহার সেই দেবতার আসনটিকে প্রদক্ষিণ করিবার সাধ হইল। ছাত্রটি পাঠ শেষ করিয়া হয়তো এতক্ষণ চলিয়া গিয়াছে; নারিকেল বৃক্ষের ছায়ায় ছায়ায় মেয়েটি আসিয়া দাঁড়াইল দক্ষিন দিকের ঘাটে—সেই বকুল বৃক্ষের তলায়। সূর্যলোকে কি একটা চক্‌চক্ করিতেছে। মেয়েটি অবনত হইয়া তুলিয়া দেখিল, একটি সুবর্ণাঙ্গুরীয়; ইহা নিশ্চয়ই ছাত্রটির; তিনি হয়ত মনের ভুলে ইহা ফেলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কেমন করিয়া

সে যথার্থ অধিকারীকে ইহা প্রত্যর্পণ করিতে পারে। [illegible] সমস্ত অন্তর কী এক অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল—কণ্ঠস্বরের স্মৃতিস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টি যেন বিধাতার দেওয়া আশীর্বাদ।

আর কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া সে বকুলতরুমূলে একটি প্রণাম করিয়া আংটিটি লইয়া গৃহে ফিরিল। গৃহে ফিরিয়াও তাহার দুই-একবার মনে হইল যে, পিতাকে দিয়া আংটিটি ফেরৎ পাঠাইলেই ভাল হয়। কিন্তু ঐ কণ্ঠস্বরের অধিকারীর এই ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু সে কিছুতেই ছাড়িতে পারিল না।

সন্ধ্যালগ্নে বিবাহ—রাজোচিত বাদ্যাদিসহ বর আসিলেন, বিবাহ হইয়া গেল। অভ্যাসবশে বাসরঘরেও মেয়েটির ঘুম ভাঙিয়া গেল ভোরের দিকে। উৎকর্ণ হইয়া রহিল সে, যদি আজ তাহার বিদায়ের শেষ ক্ষণেও আর একবার শুনিতে পায় সেই কণ্ঠস্বর—আশ্চর্য মানুষের দুর্বলতা!

প্রভাতে তাহাকে স্বামীগৃহে যাইতে হইল চিরাচরিত প্রথা মত। চতুর্দোলে বন্দিনী হইয়া মেয়েটি আসিল তাহার স্বামীগৃহে। বিশাল সে অট্টালিকা—নারিকেল বৃক্ষগুলিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহার চতুস্পার্শ্বের প্রাচীর,—মেয়েটি হইল তাহার মধ্যে চিরবন্দিনী; বংশের প্রথামত বাহিরের সমস্ত জনকল্লোল তাহার নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু প্রতি প্রভাতে—না, প্রতি রাত্রিশেষে মেয়েটির ঘুম ভাঙিয়া যায়—আর স্বামীর বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়—হয়ত তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় একত্র করিয়া শুনিতে চায় সেই কণ্ঠস্বর, যে-স্বর তাহার কুমারী-জীবনের একমাত্র উপাস্য ছিল।

মেয়েটির স্বামীও ওঠেন অতি প্রত্যুষে, কিন্তু তাহার পূর্বে স্ত্রীকে শয্যাত্যাগ করিতে দেখিয়া সুখীই হন—অথচ বুঝিতে পারেন না, কেন তাঁহার স্ত্রী প্রত্যহ জানালার নিকট দাঁড়াইয়া থাকে। অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যানের প্রাতঃ সৌন্দর্য দেখিতেও তো মানুষের আকাঙ্ক্ষা জাগিতে

পারে। জিজ্ঞাসা করিবার কি-ই বা প্রয়োজন। পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রী, তাহার ব্যবহারে স্বামী এতটুকু ত্রুটি খুঁজিয়া পান না কোনদিন।

মেয়েটি কিন্তু দূরে, বহুদূরে, যেন সেই কণ্ঠস্বর এখনো শুনিতে পায়। নিস্তব্ধ পল্লীর অপর প্রান্ত হইতে যেন সেই কণ্ঠস্বর কোন কোন দিন তাহার কর্ণে ভাসিয়া আসে.....

স্বামী উঠিয়াই বাহিরে চলিয়া যাইতেন, তারপর নানাবিধ গৃহকর্মে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। সমস্ত দিন মেয়েটি আর স্বামীর দেখা পাইত না। রাত্রে স্বামী শয্যা গ্রহণ করিলে পর মেয়েটি যথাবিধানে তাঁহার সেবা করিত এবং গভীর রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িত। কতদিন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিত, যেন বাল্যের শোনা সেই কণ্ঠস্বর শুনিতেছে; অমনি তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাইত। ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিত সে শয্যার উপর। ভয় পাইয়াছে ভাবিয়া স্বামী তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন, ভয় কি—ঘুমাও। মেয়েটি তখন আবার ঘুমাইয়া পড়িত।

দিন তাহাদের ভালই কাটিতেছিল। মেয়েটির পরিপূর্ণ প্রেমের মধ্যে কোথাও কোন গ্লানি ছিল না। স্বামীর আহ্বানে তাহার কেমন একটা মোহ আসিয়া যাইত। তাঁহার কণ্ঠেও মেয়েটি সেই বাল্যের শ্রুত মোহনীয় সুরলহরীর আভাস পাইত, কখনো কখনো ভাবিত, ইহাই তাহার স্বামীকে গভীরভাবে ভালবাসার লক্ষণ—হয়ত সেই প্রিয় কণ্ঠ-স্বরটিকে প্রিয়তম স্বামীর কণ্ঠে শুনিবার জন্য তাহার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার অনুরঞ্জন ইহা।

বিরাট চক্‌মিলান বাড়ি। বহির্বাটীতে স্বামী তাঁহার দৈনন্দিন কার্য করিয়া যান, অন্দরে মেয়েটি অসূর্যম্পশ্য শীতল হর্মতলে অঞ্চল বিছাইয়া রামায়ণ পাঠ করে কিংবা বহুমূল্য পালঙ্কে শুইয়া গভীর সুপ্তিতে মগ্ন থাকে।

স্বামী সম্মুখে আসিলে আনন্দে সারা অঙ্গ তাহার ভরিয়া যায়—কিন্তু এই আনন্দ দিবাভাগে তাহার ভাগ্যে কদাচিত ঘটে। স্বামীর নাকি বিস্তর কাজ—সময় তাঁহার এক মুহূর্তও নাই, তাই

রাত্রিতে ক্লান্তিবশতঃ তিনি শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়েন। মাঝে মাঝে মেয়েটির মনে হয়, স্বামীকে আর একটু বেশী কাছে পাইলে যেন তাহার জীবনের কোন্ এক অদৃশ্য বেদনার কাঁটাটিও উঠিয়া যায়। কিন্তু কী সে কাঁটা, তাহা সে ভাবিয়া পায় না। কতদিন ভাবিয়াছে, বিবাহিত জীবনে তাহার সেই বাল্যকালের শোনা কণ্ঠস্বরটিকে মনে করিয়া রাখায় কি সে স্বামীর নিকট অপরাধিনী হইতেছে? কিন্তু মন তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিতেছে, সংগীতে আকৃষ্ট হওয়া মানব-প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তি। ইহাতে অপরাধ কেন হইবে। গায়ককে তো সে চেনে না।

সেদিন ছিল কি একটা পর্বদিন। বংশের প্রথানুযায়ী পুণ্যাহ করিতে হয়। মেয়েটির স্বামী সেদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া বাহিরে গিয়াছেন, মেয়েটি তখনো ঘুমাইতেছে। স্বপ্নে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল তাহার বাল্যের শোনা সেই কণ্ঠস্বর। মেয়েটি উঠিয়া বসিল। না—স্বপ্ন তো নয়। এ যে একান্তই নিকটে। কোথায়—কোথায় তবে সেই কণ্ঠের অধিকারী। মেয়েটি অধৈর্য হইয়া উঠিল, চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল, তখনো ভোর ঠিক হয় নাই, অথচ স্বামী এত আগেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

স্বামী কাছে থাকিলে হয়ত সে আজ জিজ্ঞাসা করিতে পারিত, ঐ কণ্ঠস্বরের অধিকারী কে। কোথায় সে থাকে?

মেয়েটি শুনিতে পাইল—রহিয়া রহিয়া সেই স্তবগীতি ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; আকাশ-বাতাস পরিপ্লাবিত করিয়া ঝরিতেছে যেন কি এক স্বর্গীয় সুষমা।

বহু·····বহুদিন পরে সেই চিরপ্রিয় কণ্ঠস্বর মেয়েটির সারা অন্তরকে মূর্চ্ছিত করিয়া দিল কী এক ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিতে। তন্ময় হইয়া সে জানালার নিকট গিয়া শুনিতে লাগিল সে গীতধ্বনি। নিকটে, দূরে, বহুদূরে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে সে স্বর লীন হইয়া গেল আকাশে,—মহাকাশে। কিন্তু মেয়েটি তখনো চক্ষু খোলে নাই, বাল্যের স্মৃতি তাহার ক্ষুদ্র অন্তর আলোড়িত করিয়া জাগিয়া

উঠিয়াছে—সেখানে শ্যামলপুকুর, বকুল তরুতল আর সেই কণ্ঠস্বর ছাড়া কিছু নাই, কেহ নাই।

অকস্মাৎ তাহার সমস্ত স্বত্তাকে সচকিত করিয়া প্রবেশ করিলেন স্বামী। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শুভদিনে তাহার দুইচোখ জলে ভাসিতেছে কেন--কি হইয়াছে?

আত্মসংবরণ করিয়া মেয়েটি তাড়াতাড়ি সংযত হইয়া বসিল এবং সংক্ষেপে বলিল যে, তাহার কুমারী-জীবনে শ্রুত একজন ছাত্রের কণ্ঠস্বর সে আজ বহুদিন পরে শুনিয়াছে—তাই বাল্যস্মৃতি মনে উদিত হওয়ায় চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী আশ্চর্য হইয়া গেল। তবে কি তাঁহার পত্নী বাল্য-জীবনে শ্রুত একটি কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্যই প্রত্যহ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকে। আজ বিশেষ কার্য বশতঃ তিনি গুরুগৃহে যাইতে পারেন নাই, কিন্তু অন্যদিন তো প্রত্যুষে উঠিয়াই চলিয়া যান—আর তাঁহার স্ত্রী জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে কোন্ এক পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিবার অপেক্ষায়। হয়ত অমনি করিয়া অশ্রুর বন্যাও বহিয়া যায়। স্বামীর বৈষয়িক অন্তর বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি গম্ভীর হইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সমস্ত দিন তাঁহার মনের মধ্যে একটি কথাই বারবার জ্বলিতে লাগিল যে, তাঁহার পত্নী প্রতি উষায় একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করে……

স্ত্রীর উপর অবিশ্বাস পোষণ করার মত দুঃখদায়ক আর কিছু নাই। স্বামী সেই ভীষণ দুঃখের মধ্যে দিন কাটাইতে লাগিলেন। রাত্রি আসিল, শয্যায় শুইয়া তিনি পূর্বের মত স্ত্রীকে আর আদর করিতে পারিলেন না, তাঁহার সমস্ত কোমল অনুভূতিকে ডুবাইয়া জাগিয়া রহিল কী এক বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা। কিন্তু পত্নীকে খুলিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেও মনে বাধিতেছিল। বাল্যের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুত্যাগ কিছুমাত্র বিচিত্র নয় এবং প্রত্যুষে বাতায়ন-সন্নিকটে আসিয়া সৌন্দর্য উপভোগ মানুষের একান্তই প্রকৃতিগত। ইহার মধ্যে দোষের কি থাকিতে পারে। জিজ্ঞাসা করিবারই বা কি আছে।

কিন্তু কিছুতেই মন শান্ত হইল না। দিনের পর দিন সন্দেহ বাড়িয়াই চলিল আর সেই সঙ্গে বাড়িয়া চলিল মেয়েটির প্রতি উপেক্ষা, অবহেলা। স্বামীর অন্তরে যে সন্দেহের বিষ ঢুকিয়াছে, মেয়েটি তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না—তাহার ত্রুটি হইতেছে ভাবিয়া দিনে দিনে সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠে।

স্বামী বাহির বাড়িতেই রাত্রিবাস আরম্ভ করিলেন। কদাচিৎ তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখা যায়, তাহাও দিবাভাগে। পত্নী শয্যা ত্যাগ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকে—স্বামী বাহিরের ঘরে শাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন।

ধীরে ধীরে মেয়েটির জীবন-কুসুম শুকাইতে লাগিল। এতখানি অবহেলা প্রথম হইতে পাইলে হয়ত সে সহিতে পারিত, কিন্তু পূর্ণ স্বামীপ্রেম লাভের পর এই অপমানকর উপেক্ষা তাহার আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন অন্তর সহিল না—অল্পদিনেই সে শয্যা লইল। স্বামী শুনিলেন রোগ কঠিন, কিন্তু তিনি স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করিতেছেন। বিশেষ কোন খবর লইলেন না। দাস-দাসীরাই দেখাশুনা করিতে লাগিল।

একরাত্রে ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে বধূ স্বামীর সহিত শেষ দেখা করিতে চায়।

যে কারণেই হউক, আজ আর স্বামী উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, পত্নীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখলেন, যে প্রফুল্ল-কমল তিনি দরিদ্রের গৃহ হইতে আহরণ করিয়াছিলেন তাহা কঙ্কালাবশেষে পরিণত হইয়াছে। তথাপি তাহার মনে এতটুকু স্নেহ জাগিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ঐ জীর্ণ কঙ্কালের মধ্যে একটি ক্ষুধিত আত্মা কাহার কণ্ঠধ্বনি শুনিবার জন্য এখনো উৎকীর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।

মেয়েটির তখন আর ভাল করিয়া কথা ফুটিতেছে না। সে অতি কষ্টে জানাইল যে, বহুদিন পূর্বে কুড়াইয়া পাওয়া একটি আংটি তাহার বাক্সে রহিয়াছে। তাহার ধারণা, ঐ আংটিটি তাহার বাল্যজীবনে শ্রুত

[illegible] আংটির। কিন্তু তিনি কে বা কোথায় আছেন, তাহা সে জানে না। ঐ আংটিটি এই পরিবারের অলঙ্কারের সঙ্গে না রাখাই উচিৎ। উহা যেন কোন ভিখারীকে দান করা হয়।

বধূ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

স্বামী নিশ্চুপ হইয়া শুনিলেন স্ত্রীর কথা কয়টি। মুহূর্ত বিলম্ব তাহার সহিতেছিল না। সমস্ত অন্তর বিমথিত করিয়া জাগিতেছিল একটি প্রশ্ন, কে সেই আংটির অধিকারী, যে তাঁহার সারা জীবন এমন করিয়া বিষময় করিয়া দিয়াছে? কে সে? জানিতেই হইবে।

স্ত্রীর উপাধানের নিম্ন হইতে চাবি লইয়া তিনি খুলিয়া ফেলিলেন অলংকারের লৌহ সিন্দুক। কাঠের একটি ক্ষুদ্র কৌটার মধ্যে বাহির হইল একটি সোনার আংটি—স্বামী চমকিয়া উঠিলেন।

আংটিটি তাঁহারই।

আশা

আশা আমাকে ভালবেসে ফেললো। আশা আমার পিতৃবন্ধুর কন্যা। মাত্র এইটুকু সম্বন্ধ সম্বল ক'রে কেরাণীর মুখ দু'চার দিন তাদের বাড়িতে বদলাতে যেতুম। এ ছাড়া আশার সঙ্গে 'লভে' পড়বার সুযোগ তো নাই-ই যোগ্যতাও কিছু নাই। আশা সুন্দরী, কলকাতার রং-চঙে কাপড়পরা সুন্দরী নয়, সত্যিকারের সুন্দরী, যাকে দেখলে অনেকদিন মনে থাকে,—হ্যাঁ, একটি সুন্দরী মেয়ে দেখেছি বটে। আমি সুন্দর কি না জানিনে,—একদিন হয়তো কিছু সুন্দর ছিলুম কিন্তু এখন আর তার চিহ্ন নেই বোধ হয়। আশার বিদ্যে আই-এ অবধি, আমি মাট্রিক পাশ ক'রেই চাকরীতে ঢুকেছি। আশার গুণ প্রচুর, কিন্তু আমার কিছু আছে ব'লে তো শুনি নি আজো। আশার বাবা মস্ত বড় ব্যবসাদার, তিনটে মোটর রাখেন, নিজের বাড়ি কলকাতায়, আর আমি চল্লিশ টাকার কেরাণী, বাসে না চ'ড়ে পয়সা বাঁচাই এবং থাকি সস্তা মেসে। আশা অবিবাহিতা, আর আমার ছেলে পুলে না হ'লেও বিয়ে হ'য়েছে। এসব জেনেও আশা আমায় ভালবাসলো! এর চেয়ে জগতে আশ্চর্য কিছু আছে, জানো?

প্রথম যেদিন তাদের বাড়িতে যাই আশার বাবার কাছে একটা 'রেকমেনডেশন লেটার' নেবো ব'লে—যদি চাকরীর কিছু সুবিধা হয়, এই আশায়। সেদিনকার কথা আজও এত স্পষ্ট মনে পড়ে, যেন কাল সে ঘটনা ঘটেছে। পায়ে জুতা ছিল না, আধময়লা কামিজটার পিঠটা ঝাঁজরা হ'য়ে গেছে, কাপড়টায় যে কত শেলাই তা' গোনা যায় না। এমনি অবস্থায় একদিন তাদের বাড়ি গিয়ে তার বাবা রায়বাহাদুর জি, সি, চ্যাটার্জিকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার দিকে একটু তাকিয়ে ব'ললেন—কি চাই? পিতৃ-পরিচয়

দিলুম প্রথমেই। অমনি উঠে এই এতো নোংরা লোকটাকে মার্ বাহাদুর চ্যাটার্জি একঘর লোকের সামনে বুকে টেনে নিলেন। তারপর সে কত কথা। মা কেমন আছেন, বোনের কোথায় বিয়ে দিয়েছ—বাবা কি রেখে গেছেন—অসংখ্য প্রশ্ন। প্রত্যাশীর দল সেদিন আর কোন আশা না দেখে ফিরে গেলো। ঘর খালি হ'তেই মিঃ চ্যাটার্জি ডাকলেন—আশা মা।

একটি কিশোরী এসে ঢুকলো। এই আশা—বয়স কতই বা আর,—পনের হবে। রায়বাহাদুর বললেন—দেখছিস্ আশা, এই আমার সেই পরম বন্ধু আশুবাবুর ছেলে, প্রণাম কর।

মেয়েটি তখুনি আমাকে প্রণাম ক'রে উঠে বললে—এত ময়লা কাপড় কেন?

হেসে বললুম—পয়সা নেই কেনবার।

—ওঃ—ব'লে সে তার বাবার দিকে চাইলে। তারপর সেই বাড়িতে কি আদর-যত্নেই না দিনকতক কাটালুম। সর্বদা আশা থাকতো আমার কাছে। তার মা (আমি কাকীমা বলি) মায়ের মতই আজও আমাকে আদর-যত্ন করেন।

দিন ছয় পরে রায়বাহাদুরের সুপারিশে এই চল্লিশ টাকার চাকরী। বিদ্যে বেশী থাকলে ভাল চাকরীই হোত, কিন্তু আমি তো মাত্র ম্যাট্রিক পাশ—তাতে এই বাজার। চাকরী হবার পর কিন্তু আশাদের বাড়িতে আর থাকতে পারলুম না। আত্মসম্মানে যেন ঘা লাগে। পিতৃবন্ধুর বাড়িতে কি অমনি ক'রে বেশী দিন থাকা যায়! গরীবের এই আত্মমর্যাদাজ্ঞান যেন একটু বেশী; অন্ততঃ আমার আছে।

অফিস থেকে পনের টাকা 'এডভান্স' নিয়ে মেসে এসে বাসা বাধলুম। রায়বাহাদুর, কাকীমা এবং বাড়ির সকলেই, আশার দাদারা এবং বৌদি'রা—আমার চলে আসায় খুবই ক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু উপায় কিছু ছিল না। আর আমি জানতুম, এই ক্ষুণ্ণতাতেই মানুষের মর্যাদা বাড়ে।

আশা কিন্তু একটুও ক্ষুণ্ণ না হ'য়ে বললে—মেসে থাকবেন তো? খুব ভালো—আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসবো।

পুরুষের মেসে যে মেয়েদের যেতে মানা, সে জ্ঞান তাকে সেদিন আমি দিলুম না। কথাটা শুনতে যেন খুব ভাল লাগলো, বললুম—যাবে বৈ কি?

—আপনিও শনিবার শনিবার আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসবেন কিন্তু।

—তাতো আসবোই।

আশা পরমোৎসাহে আমার যাত্রার যোগাড় করে দিল। আমার কিছু ছিল না। আশা কোত্থেকে একটা তোষক, একটা বালিশ, একটা নতুন মশারী আর ছোট একটা টিনের স্যুটকেশ এনে বললে—কিসে যাবেন, মোটরে?

—না, রিক্সাতে।

তখনি সে দারোয়ানকে রিক্সা ডাকতে বললে। আমাকে না বিদায় ক'রে যেন তার ঘুম হ'চ্ছে না।

মেসে অধিষ্ঠিত হ'য়ে গেলুম। প্রথম প্রথম প্রত্যেক শনিবারে ঠিক দু'টর সময় অফিসের টেলিফোনে ডাক পড়তো। রিসিভার কানে দিতেই শুনতুম আশার গলা—আজ আসছেন তো।

বলতুম—আজ আর যেতে পারবো না—কাজ আছে।

—সে হ'চ্ছে না, আসতেই হবে। আজ গ্লোবে যাব মনে করেছি—আসুন।—ফোন ছেড়ে দিয়ে আশা চ'লে যেতো।

সে যেন তখন থেকেই জানতো তার ঐ 'আসুন' হুকুম অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই। যেতেই হ'ত।

দিন কয়েক পরেই আশাকে 'তুমি' বলতে লাগলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে সে-ও 'আপনি' কে 'তুমি'তে নামিয়ে আনলে।

শনিবার সন্ধ্যাটা কিন্তু কাটতো বেশ। সিনেমায় আমরা বেশী যেতুম না। কারণ আশা সিনেমা দেখতে যেতে চাইলেই তার বৌদিরাও যেতে চাইতেন। আশার কাছে সেটা বড় প্রীতিপ্রদ ছিল

না। বলতো, কথা বোঝে না, কবিতা বোঝে না, ওদের নিয়ে আবার বেড়াতে যায়!—মেয়ে জাতটা একদম অকর্মণ্য।

'কোন মেয়ের মুখে একথা শোভা পায় না'—যদি বলতুম তো খুব খানিক হেসে কোঁকড়া চুল দুলিয়ে সে বলতো—আমি কি মেয়ে নাকি? আমি তো ছেলেই!

শরীর ওর নিটোল, নিভাঁজ, নিখুঁত—একটি সতেজ বর্ধমান কলাগাছের মত। দেহটিকে দেখলেই মনে হয়, বিশ্বশক্তি যেন তাতেই কেন্দ্রীভূত।

বৌদিদের জ্বালায় আশা সিনেমা দেখা ছেড়ে দিলে। বলতো, তোমরা দাদাদের সঙ্গে যাও না বাপু আরাম পাবে—তোমাদের রান্নাবান্না আর খোকা-খুকার গল্প আমরা শুনতে পারবো না; দাদাদের বলগে।

বড় বৌদি লোক খুব ভাল। আশা তাঁকে একটু সমীহ করে আর বলে—তুমি যদি ভাই মেজ বৌদিকে আর ছোট বৌদিকে লুকিয়ে আসতে পার তো এস—সিনেমা দেখিয়ে আনবো। বড় বৌদি'র কাজ খুব বেশী, সমস্ত সংসার তাঁর ঘাড়ে, কাজেই তিনি বড় সময় পান না।

মেজ বৌদিকে আশা দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তাঁর অপরাধ, তাঁর বাবা স্যার উপাধিকারী এবং শহরের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। আশা বলে—তোমার বাবা স্যার হয়েছেন, তাই ব'লে আমরা তোমার অত গুমর সইবো কেন—ধনীর দুলালী, ধনী বাপের কাছে গুমর করগে।

তা' আশা বড় মিথ্যে বলে না। মেজ বৌদির সত্যিই একটু গুমর আছে। তিনি দিনরাত নিজের সাজ-সজ্জা, কাপড়-গয়না নিয়েই ব্যস্ত এবং তাঁর কাছে গেলেই তাঁর বাপের বাড়ির কথা শুনতে হ'বে।

ছোট বৌদি আশার প্রায় সমান বয়সী। তাই আশা তাকে একটু কৃপার চক্ষে দেখে। বলে—লেখাপড়া তুই শিখলিনি বৌদি, ছোড়দাকে কি করে সামলাবি? ঐ দুরন্ত বালক!—আমরা সবাই হেসে উঠি।

আশা চোখ পাকিয়ে বলে—হাসছো কি, লজ্জা করে না ?

বাড়ির সবারই ছোট ব'লে আশা বাড়ির সবারই স্নেহ বেশী পেয়েছে, এমন কি ভৈঁজু দারয়ানটাও তাকে বেশী খাতির করে। কাকীমার সঙ্গে আশার সম্পর্ক নিতান্তই অল্প। নেহাৎ দরকার না পড়লে তাঁর কাছে সে যায় না ; তার যতকিছু আব্দার বাবার কাছে। রায়বাহাদুর এই আধ-পাগলা মেয়েটাকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে পুরো পাগল না ক'রে ছাড়বেন না দেখছি।

একদিন শনিবার গেছি আশাদের বাড়ি। রায়বাহাদুরের বসবার ঘরে আশা তার বাবার চেয়ারের হাতলটায় ব'সে তাঁর পাকা চুল তুলছে আর বলছে—কি দুষ্টু বাবা তোমার ঐ বন্ধুর ছেলেটা! দুটোয় ছুটি হয়েছে, সাড়ে তিনটেতেও আসবার নাম নেই।

আমারই কথা হ'চ্ছে শুনে বাইরে দাঁড়িয়ে গেলুম। রায়বাহাদুর হেসে বললেন—নাই বা এল রে—কি দরকার তোর তার সঙ্গে ?

দরকার অনেক বাবা। কি সুন্দর যে গল্প বলতে পারে ও, তুমি শুনলে তুমিই শুনতে চাইবে। ধানগাছে কেমন ঢেউ খেলে, অশথ গাছে কি ক'রে বাবুই পাখী বাসা বাঁধে, পুকুরের একঘাটে ডুব দিয়ে আর এক ঘাটে কি ক'রে পানকৌড়ির মতন ওঠা যায়—এই সব কথা এত চমৎকার বলে।

রায়বাহাদুর হেসে উঠলেন আমায় দেখতে পেয়ে, আশাও দেখতে পেলে। লজ্জায় সে কি রাঙা হ'য়ে উঠবার মেয়ে ? বললে—কেন এত দেরী করলে ? রায়বাহাদুর মাথাটা টেনে নিয়ে বললেন—যা, এবার পানকৌড়ির গল্প শুন্‌গে।

এমনি ক'রেই বেশ কিছুদিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু আশা বড় হয়ে উঠলো। একেই তো সে স্বাস্থ্যবতী ব'লে পনেরতেই আঠারোর মত দেখাতো, ষোলয় পড়তেই কাকীমা বায়না নিলেন—বিয়ে দাও। বিয়ে কিন্তু আশা কিছুতেই করবে না। আমাকে সে অনেকবার বলেছে এ-কথা। আমি হেসেই উড়িয়েছি। তখন কে জানতো যে ওইটুকু মেয়ের মনের জোর এত বেশী।

আশার মেজদা'র বন্ধু সুশীলবাবু বেশ ভাল ছেলে। মস্ত বড় লোকের ছেলে, এম্-এ পাশ, দেখতেও খুব সুন্দর।

বাড়ির সকলের ইচ্ছে, আশাকে সুশীলের হাতে দেবে। সুশীলও তাকে খুব পছন্দ করে; না করবার কোন কারণ নেই। কিন্তু আশা তাকে মোটে আমল দেয় না। সন্ধ্যা বেলা দাদারা ও সুশীল এবং আমি ব্রীজ খেলতে ব'সে চা চাইলে আশা চা নিয়ে আসে, ব'সে খেলাও দেখে। সুশীলবাবু তাসগুলো গুটিয়ে বলেন—আর খেলতে হবে না, তার চেয়ে আশা দেবী একটা গান শোনান। আশা তীব্র মুখভঙ্গী ক'রে বলে,—ফরমাস করলেই কি আমায় গাইতে হ'বে না কি? মেজদা' কট্‌মট্ ক'রে তাকান। আশা তাসগুলো তুলে নিয়ে ডাকে,—ওরে মন্তু, মীরা—আয় ম্যাজিক দেখাবো।

সুশীলবাবু একটু লাল হ'য়ে ওঠেন, একটু হেসে বলেন—আচ্ছা ম্যাজিকই তবে দেখান, আমরাও দেখি।

তাসগুলো ফেলে দিয়ে আশা বড়দা'কে বলে—আচ্ছা বড়দা, আমাদের দমদমার বাগানে একটা গোশালা করলে হয় না। আমি নয় সেখানে দেখবো-শুনবো।

সুশীলকে ও চায় না; কিন্তু বাড়ির সবাই একদিন যুক্তি করে কথাটা সরাসরি ওর সামনে পাড়লে। মেজ বৌদি' বললেন—সুশীলবাবু বেশ ভাল ছেলে, না রে আশা!

—হ্যাঁ, একদম নিছক ভাল ছেলেই বটে!

মেজদা' রেগে বললেন—মানুষকে অমন হতশ্রদ্ধা করিস কেন আশা?

চোখ কপালে তুলে আশা বললে—হতশ্রদ্ধা কই করলুম?

বড়দা' এসে আশার পিঠ চাপড়ে বললেন—লক্ষ্মী বোন্‌টি, সুশীলকে তোর পছন্দ হয় কিনা আমাদের ঠিক ক'রে বল্ দেখি?

বড়দা'কে আশা খুব ভক্তি করে। তাঁর কথা কাটেও না বড় একটা। মুখে শান্ত ভাব এনে সে বললে—তুমি কি বুঝে আমাকে একটা অপদার্থ ধনীর ঘরের পুতুল সাজাতে চাইছো বড়দা? বাপের

টাকায় সিল্কের পাঞ্জাবী উড়িয়ে ব্রীজ খেলতে এলেই মানুষ মহাপুরুষ হয় না, এম-এ পাশ করেও চতুর্ভুজ হয় না। ঐ তুলতুলে ননীর শরীর দিয়ে কুটোটি কাটবার যার শক্তি নেই তাকে বিয়ে ক'রে খাঁচায় পুরে রাখবার মত খাঁচা আমার নেই।

সুশীলবাবুর সম্বন্ধে আমরা সবাই নিরাশ হ'য়ে গেলুম।

সুশীলবাবুও আর বেশী ব্রীজ খেলতে আসতো না। শুনেছি, সে এখন বিয়ে ক'রে সুখে আছে।

ম্যাট্রিক পাশ ক'রে আশা কলেজে ভর্তি হ'ল। বাড়িতে পড়ার নাকি অসুবিধা এবং যাতায়াতে অনর্থক সময় অপব্যয় হবে ভেবে সে এখন কলেজ-সংলগ্ন বোর্ডিং-এ থাকে। শনিবার বাড়ি যায়, আমিও শনিবার যাই, তাই আমাদের দেখা-শোনার কিছু ক্ষতি হয় না। আশা আজকাল কাব্যচর্চা করতে লেগেছে। রবিবাবুর যতো ভালো ভালো কবিতা তার মুখস্থ হ'য়ে গেল। কবিতা লিখেছেও বেশ, কিন্তু আমাকেই শুধু দেখায়। বলি,—দাও না একটা,—এক সম্পাদককে দিয়ে আসি।

আশা রেগে বলে—কি রকম! আমার কবিতা শুধু আমারই জন্যে, ও আমি কখনো ছাপাবো না।

—দেশের লোক পড়ে আনন্দ পাবে যে।

—না, কবিতা লেখার শেষ ক'রে দিয়েছে রবিঠাকুর। এখন আমরা যা' লিখছি, সেটা শুধু নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে। সাহিত্যে নতুন কিছু দেবার দিন আসে তো এক শতাব্দী পরে। তবে হ্যাঁ, কয়েকজন অশ্লীল কিছু লিখে নাম জাহির করছে বটে, কিন্তু অমন ফাঁকা নাম তো আমি চাই না।

এর পর আর কথা যোগায় না। আশার লেখা কবিতা পড়ি আর ভাবি—সুন্দর। এ-গুলো বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ না হ'লে যেন সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হবে, কিন্তু উপায় কি। আশা তার কবিতা

কোন দিনই ছাপতে দেবে না। দু' একবার মনে করেছি, চুরি ক'রে নিয়ে কাগজওয়ালাদের দিয়ে আসবো, কিন্তু ভয় করে। যা মেয়ে, যখন জানতে পারবে, অনর্থ ক'রে ছাড়বে।

আমার ছোটবেলা থেকেই লেখা অভ্যাস। এখন যা কিছু লিখি সব-তাতেই আশার ছায়া এসে পড়ে। ওর দৃপ্ত ভঙ্গী যেন আমার মনে কেটে কেটে বসেছে। ভাল মেয়ের কথা মনে হ'তেই আমার সুমুখে আশার মূর্তি এসে দাঁড়ায়, যেন ও ছাড়া আর পৃথিবীতে নারী নেই। তবু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি ওর প্রভাব অতিক্রম করতে, কারণ সব গল্পের ঐ একটি মেয়ের আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে তারিফ পাবো, বাংলা দেশে এমন ফাঁকি আর চলে না।

আশা আমার লেখা শুনতে চায়, কিন্তু শোনাতে আমার অত্যন্ত বাধে। কেন যে বাধে তার সম্বন্ধেও ভেবে দেখেছি। হয় তো যে লেখাটা আমি নিজে বেশ ভাল মনে করি এবং যে-কোন সমালোচককে শোনাতে পারি, আশার কাছে সেটাও পড়তে আমার গলায় স্বর আটকে যায়। যদি আশা খারাপ বলে। কি লিখলে এবং কেমন লিখলে যে ওর ভাল লাগবে, আমি জানি না, কখনো জানবো কিনা তাও জানি না।

আমাকে দেখেই আশা বললে—একদম কবি হয়ে গেছ দেখছি যে, তেল মাখনি ক'দিন?

সত্যিই চুলের অবস্থা ভাল ছিল না, খেলা দেখতে যা'ব, তাই চুল আঁচড়াবার কথা মনে ছিল না। অনিচ্ছায় কোন কাজ করতে চাইলে, এই রকমই হয় বোধ হয়। বললুম—কবি হই নি, সন্ন্যাস নেবো ভাব্‌ছি।

—বলো কি? তবে বৌদিকে টেলিগ্রাম ক'রে দিই, এসে সামলাবেন; কিন্তু এতো বৈরাগ্যের হেতু কি? বৌদি কি আজকাল চিঠি লিখছেন না?

ওর কথায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। গলায় ঝাঁজ এনে বললুম,—চুপ করো আশা, সব সময়েই ইয়ারকি করতে নেই।

আশা হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

একটু পরে আশা বললে—এ ক'দিনে কি লিখলে, দেখি?

—কিছু না, লেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন? আমি খারাপ বলেছি বলে?

—হ্যাঁ।

—কেন, ভাল তো ঢের লোকেই ব'লে থাকে—আমার ভাল না লাগায় কি তোমার ব'য়ে গেলো।

কি যে ব'য়ে গেলো, তা নিজেই বুঝতে পারিনে, ওকে বোঝাব কি দিয়ে! তবু জোর করে বললুম—কে কোথায় ভাল বলে, না বলে আমি তো দেখতে যাইনে, শুনতেও পাইনে, যারা পরিচিত তারা যদি প'ড়ে ভাল বলে তবেই না লেখা সার্থক?

—ভাল না লাগলেও ভাল বলতে হবে না কি? আচ্ছা, এবার থেকে না হয় ঐ রকম খোসামুদির কথাই বলা যাবে। কিন্তু সে মিছে কথা, খোসামুদির কথা, তা তোমায় জানিয়ে রাখছি।

কি আর বলবো? যিনি প্রশংসা করবেন তিনি পূর্বেই জানিয়ে রাখছেন, যা' তিনি বলবেন তা' মিছে কথা!

আশা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললে,—বললে--শোন, তোমার লেখার প্রশংসা বহু লোক করছে, নিন্দেও করে ঢের লোক; কিন্তু তোমার কাছে তোমার পরিচিত সবাই বলে বেশ লিখছেন। আমাকে কি তুমি সেই পরিচিতের দলে ফেলতে চাও? তা' যদি চাও তো আমার কাছে তোমার কোন লেখা আর শুনিও না। আমি না প'ড়েই বলবো, 'সুন্দর লিখছো, চমৎকার, বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় নাস্তি।' আর যদি আমাকে তোমার সত্যি সাহিত্যিক বন্ধু মনে করো তবে কোন্‌খানটা আমার ভাল লেগেছে তোমায় নাই বা বললুম, কোন্‌খানটা মন্দ লেগেছে এবং কেন মন্দ লেগেছে তাই শুধু আমি বলবো। সুমুখে তোমার প্রশংসা করবার লোকের তো অভাব নেই,

তোমার ত্রুটি দেখিয়ে যদি দিতে পারি তবেই আমি তোমার যোগ্য বন্ধু হ'তে পারবো। অবশ্য আমার সমালোচনা তুমি নাও গ্রহণ করতে পারো। কিন্তু আমার মতটাও তো খ'ণ্ডে দিতে হবে, নইলে তোমার গল্প তোমার মুখে শুনে তার আলোচনা করায় লাভ কি?

কথাটার সত্যতা এমন ক'রে আমাকে বিহ্বল করলে যে মনে হোল, আশার চেয়ে নিকটতর সাহিত্যিক বন্ধু আমার আর কেউ নেই। সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে আমি তাকে বললুম, তাই ক'রো, আমার দোষগুলোই তুমি দেখিয়ে দিয়ো, যা বড় বেশী লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায় না জগতে। ওতে আমার সত্যি উপকার হবে। তবে ভাষাটা অত তীব্র না করাই ভাল।

খিল খিল করে হেসে আশা বললে—তীব্র ভাষায় খোঁচা না খেলে তোমাদেব 'খেজুরে' সাহিত্যিক বুদ্ধির রস ঝরে না যে! জান তো, কবি আর খেজুর গাছ একই পদার্থ। খেজুর গাছে রস ঝরে শীতকালে, যখন সমস্ত প্রকৃতি জড় হ'য়ে থাকে, আর সেই রস ঝরাতে হয় গাছের বুকে ক্ষত করে।

এর পর থেকে আশা আমার সাহিত্যের খোলাখুলি আলোচনাই করতো। তার ব্যঙ্গ তার বিদ্রূপ আমায় কষ্ট যে না দিত তা নয়, তবু মদের ঝাঁজের মত ওর যেন একটা নেশা আছে। মদ খেতে হ'লেই ঐ ঝাঁজটুকু যেন সইতেই হ'বে।

পাড়া-গাঁ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আশার নেই। ওসম্বন্ধে তার যা কিছু বিদ্যে বই-এর পড়া, আর আমার মুখ থেকে শোনা। তাই সে আমার স্কুল-জীবনের দুরন্তপনার কাহিনী, নদীর জলে সাঁতার কাটার গল্প, বাগানে আম চুরির ইতিহাস এমন নিবিষ্ট মনে শুনতো যে, বৈষ্ণব চূড়ামণিও রাধা-কৃষ্ণের কথা অমন করে শোনে না। আমার বলতেও খুব ভাল লাগতো; ছেলেবেলার কথা

বলতে কার না ভাল লাগে! আমার লেখার মধ্যে পল্লীর বর্ণনাটুকু শুনতে তার মুখ-চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো। মাঝে মাঝে বলতো—চলো, তোমার পাড়া-গাঁ এবার আমি দেখবোই।

পূজোর ছুটি এসে পড়লো, আমার অফিস বারো দিন বন্ধ। আশার বাবা সপরিবারে পশ্চিমে যাবেন। আমাকে ডেকে বললেন—চলো, আমাদের সঙ্গে।

যাবার খুব ইচ্ছে, কিন্তু বাড়িতে মা যে কতদিন থেকে ডাকছেন; সাত মাস মা'কে দেখিনি, তা ছাড়া স্ত্রীও তো আছে। বললুম—আজ্ঞে, মা যেতে মত দেবেন না, আর মা'কে দেখতে আমার বড্ড ইচ্ছে করছে। রায়বাহাদুর হেসে বললেন—বেশ বাবা, বেশ, মা'র কাছেই যাও। মা'র ছেলে কি অন্য কোথাও যেতে চায়!

আশা এসে বললে—আমিও ওর সঙ্গে যাবো বাবা, পশ্চিমে বেড়াতে আমি যাবো না।

—তা' কি করে হবে মা? ও' বারো দিন পরে ফিরে আসবে তুই কি সেখানে একমাস থাকতে পারবি? আমরা তো এক মাসের আগে ফিরছি না।

—বারো দিন পরে ও' আমায় তোমাদের কাছে দিয়ে আসবে।

রায়বাহাদুরের আপত্তি করবার কিছুই ছিল না। তিনি বললেন,—তা' যেতে পারো।

কিন্তু আমার আপত্তির যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ আমি গরীব, বড়লোকের মেয়েকে নিয়ে গিয়ে সম্মানে রাখতে পারবো না। তারপর আমাদের পাড়াগাঁয়ে এত বড় অবিবাহিতা মেয়ে দেখে লোকে হয়তো ওর সামনেই ওকে কিছু খারাপ ব'লে বসবে। আশা সেটা সহ্য করতে পারবে না হয়তো। এই সব ভেবে আমি চট ক'রে কিছু বলতে পারলুম না। আশা আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়েই কি যেন বুঝে বললে—কিন্তু তোমার বোধ হয় নিয়ে যাবার ইচ্ছে নাই, না?

সত্যি ইচ্ছে যে নেই তা' বলা চলে না। বললুম—অনিচ্ছার

কিছু নেই, তবে তুমি সেখানে থাকতে পারবে কিনা তাই ভাবছিলুম।

—আচ্ছা, সে আমি বুঝবো।

বাসায় এসে মাকে চিঠি লিখে দিলুম, আমার সঙ্গে আশা যাবে। সব ঠিক, রায়বাহাদুর রাত্রি আটটার ট্রেনে যাবেন, আর আমরা ঘণ্টা দুই পরে দশটা পনোরোর ট্রেনে যাবো।

এক সঙ্গেই হাওড়া স্টেশনে এসে আগে রায়বাহাদুরদের তুলে দিলুম। আশাও গাড়ীতে উঠলো, তার বাক্সটিও তুলে নিলে। বললুম—ওকি আশা, আমাদের বাড়ি যাবে না? আশা বললে—কই আর গেলুম, পশ্চিম দেখতেই ইচ্ছে করছে বেশী।

—কিন্তু আমি যে তোমাকে নিয়ে যাবো ব'লে চিঠি লিখে দিয়েছি। মা কি বলবেন?

—থাক না, গরমের ছুটিতে যাবো।

কি জন্যে যে আশা যেতে চাইছে না, বুঝলুম। আমার মনের কথা সে যেন জান্‌তে পেরেছে; একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। কিন্তু তবু যেন কোথায় কাঁটা বিঁধে রইল।

আশাদের নিয়ে ট্রেন চলে গেলেও আমি প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি বোকার মত। একটা 'ক্রু' এসে বললে—কোথায় যাবেন? উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে এলুম।

বাড়ি এসে প্রায় প্রত্যেক দিন আশাকে চিঠি লিখতুম পল্লী-জীবনের দৈনন্দিন খুঁটিনাটির খবর দিয়ে; উত্তরে সেও তাদের ভ্রমণ-কাহিনী লিখতো, আর তার মধ্যে দু'একটা তার মনের সত্যরূপও বেরিয়ে আসতো। মেয়েদের মনের গোপন কথা জানবার সৌভাগ্য পুরুষ-লেখকদের কম, আশা সে অভাব আমার অনেকখানি ঘুচিয়েছে। মনে আর মুখে তার কিছু তফাৎ নেই। সে মনে যা' ভাবে মুখে তা' বলতে বেশী কুণ্ঠিত হয় না। এই গুণে তাকে যেন আমার আরো বেশী ভাল লাগে। আজকালকার ভদ্রতার যুগে মনের কথা যে যত ঢাকতে পারে তার ততই ত' বাহাদুরী! আশা কিন্তু

মোটেই ঢাকতে চায় না। চিঠিতে সে লিখেছে—তুমি আমায় নেহাৎ দায়ে প'ড়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে। নইলে এমন ধিঙ্গী মেয়েকে নিয়ে যেতে তোমার ইচ্ছে ছিল না। বৌদি খারাপ কিছু ভাবতে পারেন, তাই আমিও গেলুম না। কথাটার ভিতর একটা তীব্র সত্য ছিল, আমার মন নাড়া দিয়ে উঠলো। পল্লীবাসিনী স্ত্রী—শহরের হাবভাবে অভ্যস্তা আশাকে নিশ্চয়ই সহ্য করতে পারতো না। ব'সে আছি, আশা হয়তো পাশেই এসে গা ঘেসে ব'সে পড়লো, হয়তো আমার চুল টেনে দিতে লাগলো,—এমনি কত কি। প্রথম প্রথম আমারই যেন কেমন কেমন লাগতো, এখন অবশ্য সহ্য হ'য়ে গেছে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এত বড় একটা মেয়ে যদি নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয় পুরুষের সঙ্গে অমন ব্যবহার করে, তবে তাকে তখুনি ঢাক পিটিয়ে বের করে দেওয়া হয়। আশা যে কি ক'রে এত সব বুঝলো জানিনা, তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের বাড়ি না গিয়ে ভালই করেছে।

আশার কথা বাড়িতে প্রায়ই বলতুম। সে আমায় খুব যত্ন করে শুনে মা তাকে দূর থেকেই স্নেহাশীর্বাদ পাঠালেন। কথাগুলো এমন ভাবে বললুম যে, বৌও তাকে ভাল না বেসে পারলে না। আশার খবর সবাই জানলে। তাকে না দেখেও সবাই চিনতে পারলে যেন।

ছুটি ফুরুলে কলকাতা এসে শনিবারটা কোথায় কাটাব ভাবি। আশাদের আসবার এখনো অনেক দেরী আছে। ভেবে কিছু ঠিক না হওয়ায় গোলদীঘির চারিপাশে ঘুরে বেড়াই। এমনি ক'রে মাসখানেক কাটতেই একদিন মেসের দরজায় মোটরের হর্ন বাজলো। চাকর এসে বললো—গাড়ীতে এক দিদিমণি আছেন, আপনাকে ডাকছেন। গিয়ে দেখি—আশা।

আমাকে দেখেই সে হেসে উঠলো, বললে—আজই দশটায় পৌঁচেছি। তখন অফিসে ছিলে তুমি, চলো।

—কোথায় যেতে হ'বে?

—বাড়ি।

—কেন? দেখা করতে?

—বাঃ রে। বিজয়ার প্রণাম করবে না?

ভুলে গিয়েছিলুম। অত্যন্ত লজ্জা বোধ হোল। আমার যারা এতো হিতৈষী তাদের বিজয়ার পর প্রণাম করার জন্য তাদের বাড়িরই মেয়ে এসে নিমন্ত্রণ করে। তখুনি আশার সঙ্গে তাদের বাড়িতে এলুম। এতদিনের অনেক কথা—দু'পক্ষেরই মনে জমা ছিল। কাজেই অনেক রাত হ'য়ে গেল; খেয়েই মেসে এলুম।

কয়েকদিন পরে অফিসে কাজ করছি, বেয়ারা এসে বললে—ফোনে ডাকছে। গিয়ে দেখি রায়বাহাদুর কথা বলছেন। তিনি বললেন, আজ পাঁচটার সময় আশাকে দেখতে আসবে। আশা বোর্ডিং-এ আছে, তাকে কেউ দেখতে আসবে শুনলে সে নিশ্চয়ই বোর্ডিং থেকে আসবে না। আমি যেন আশাকে অন্য কোন কিছু একটা বলে চারটের মধ্যে বাড়ি নিয়ে আসি। কে দেখতে আসবে জিজ্ঞাসা করায় রায়বাহাদুর বললেন—শালখের জমিদার রমেশ মুখুর্জে তাঁর একমাত্র পুত্রের জন্য আশাকে চান। ছেলেটি এম-এ পাশ করেছে, বিলেত যাবার ইচ্ছে আছে। তবে তার পূর্বে রমেশবাবু ছেলের বিয়ে দিতে চান। ছেলেটি খুব ভাল, পিতৃভক্ত। দেখ না, এযুগেও নিজে মেয়ে দেখতে না এসে বাবাকে পাঠাচ্ছে। বাবা যা করেন তাতেই ওর সম্মতি। এখন আশাকে রাজি করাতে পারলেই হয়।

রায়বাহাদুরকে যাবার সম্মতি দিয়ে ব'সে ভাবতে লাগলুম—আশা জমিদার গৃহিণী হবে, ভালই হোল; এমনি একটি পাত্রই তো ওর জন্যে আমরা চাইছিলাম। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন—সবই ভাল মিলেছে।

তিনটার সময় অফিস থেকে বেরিয়ে আশার বোর্ডিং-এ এলুম। তাকে বললুম—কাকীমা আজ কি-সব রান্না করেছেন, আমাদের খেতে ডাকছেন। চলো, বাড়ি যাই।

গাড়ী ডাকো 'বাসে' আমি যাবো না।

ট্যাক্সি ডেকে তাকে নিয়ে ওদের বাড়ির দরজায় এসে নামলুম।

দারোয়ানটার বেশভূষা আজ বদলে গেছে। ধোলাই কোট, পাজামা প'রে মস্ত লাঠিটা বাগিয়ে সে বসে ছিল, আমাদের দেখেই এক মুখ হেসে সেলাম জানালে। তাকে এমন বেশে দেখেই আশা বললে—কি ফৈজু ব্যাপার কি? হঠাৎ বাবু হয়ে গেলে যে?

হাসতে হাসতে ফৈজু বললে—দিদিমণিকো সাদি হোগা, আউর হাম বাবু নাই বনেগা?

মুহূর্তে আশা ব্যাপার বুঝে আমার দিকে এমন করে চাইলে যে, আমার বুক কেঁপে উঠলো। পাগলা মেয়েটা এখনি হয়তো একটা কাণ্ড বাধাবে। কিন্তু আশা কিছু বললে না। আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকে গেলো। পিছনে পিছনে আমিও ঢুকলাম। রায়বাহাদুর বাইরের ঘরেই ছিলেন। আমায় ডেকে কয়েকটা কাজের ভার দিলেন। যাঁরা আসবেন তাঁদের অভ্যর্থনার আয়োজনে আমরা ব্যস্ত হ'য়ে পড়লুম।

সাড়ে চারটার সময় তিনজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন। রমেশবাবু ও তাঁর দু'জন বন্ধু। তাঁদের যথারীতি অভ্যর্থনা ক'রে বসাতেই রমেশবাবু বললেন—আমাদের একটু দেরী হয়ে গেছে, শুভ লগ্ন প্রায় হ'য়ে এসেছে। আগে মেয়ে দেখান, নইলে বারবেলা পড়বে।

আশার মেজদা' গেলেন আশাকে আনতে। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট পনের মিনিট—মেজদা আর আসেন না। রমেশবাবু খুব তাড়াতাড়ি করছেন, লগ্ন নাকি পার হয়ে যাচ্ছে। আশার বাবা বড়দাকে যেতে বললেন। তিনিও গিয়ে আর ফেরেন না! ব্যাপার কি—আমাকে দেখতে বললেন। গিয়ে দেখি আশা তার ঘরে খিল দিয়ে কাঁদছে আর বাইরে গোষ্ঠী-সুদ্ধ লোক অনুনয়-বিনয়, তর্জন গর্জন করছে আশা কিছুতেই বেরুবে না। সে বলছে—আমি কি সং নাকি, যে আমাকে সবাই দেখতে আসবে? আমি যাবো না।

আমার অত্যন্ত রাগ হোল। সব এই আজকালকার শিক্ষার

সেজেছো। ভদ্রলোকদের এইখানেই ডেকে নিয়ে আসি, দেখে যান। দেখলুম, কথাটায় কাজ হোল। আশা বললে—আমি যদি বিয়ে না করতে চাই।

তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো আমরা বিয়ে দিচ্ছি না। ভদ্রলোক যখন বাড়িতে এসেছেন, একবার গিয়ে দাঁড়াতে কি দোষ? বিয়ের কথা পরে। দেখা দিলেই তো তোমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না।

—আচ্ছা, চলো।

আশা বেরিয়ে এলো। বড় বৌদি বললেন—কাপড়টা বদলে নে।

—না।

কথাটা আশা এতো জোর দিয়ে বললে যে, আমরা কেউ আর কিছু বলতে সাহস করলুম না। চলুক তো এখন, কাপড় না বদলালেও চলবে। মেজ বৌদি বললেন—গিয়ে প্রণাম করিস, বুঝলি।

আশা চুপ ক'রে রইল।

ঐ ধুমায়িত আগ্নেয়গিরিকে আমরা আর ঘাটালুম না। বাইরের ঘরে এসে আশা তিনজন বৃদ্ধকে তিনটি প্রণাম করলে। রূপ তার যথেষ্ট আছে, কাজেই সাজ না করার ত্রুটি কারও চোখে পড়লো না। বৃদ্ধ রমেশবাবু তার দিকে মিনিট খানেক তাকিয়ে থেকে বললেন—বেশ মেয়ে! তোমার নাম কি মা?

—আশা চ্যাটার্জি।

বড় বৌদি অন্তরালে গুঞ্জন করলেন—মুখপুড়ি আর কি! আশালতা দেবী বলবি, তা' না আশা চ্যাটার্জি।

রমেশবাবু মুচকি মুচকি বেশ একটু হাসছিলেন। বললেন—বেশ নাম। আচ্ছা মা, তুমি রান্না-বান্না কিছু জানো।

—জানি।

—কি কি জানো?

—ডাল, ভাত, তরকারি, মাছ, মাংস, ডিম চপ, কাটলেট, চা, টোস্ট, পান, তামাক-সাজা।

সবাই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলুম। রমেশবাবু হাসতে হাসতে বললেন—বেশ মা বেশ। এমনি সপ্রতিভ মেয়েই আমি চেয়েছিলুম।

একটু থেমে আশার পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে তিনি বললেন—যাবে তো মা আমার ঘরে? আমার মা হ'তে পারবে তো?

—না, কারুর মা-বাপ হওয়া আমার পোষাবে না।

ঘরে যেন বজ্রপাত হোল। আমরা সবাই এক সংগে চমকে উঠলুম।

আশা সটান উঠে নমস্কার করে কোনদিকে না চেয়ে চ'লে গেলো। রমেশবাবু, রায়বাহাদুরের লজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে বললেন—ওরকম হ'য়েই থাকে আজকালকার মেয়েরা। বিয়ের নামে ক্ষেপে ওঠে, আবার বিয়ে হ'লেই ঠিক হ'য়ে যায়। মেয়ে আমার পছন্দ হ'য়েছে রায়বাহাদুর। আপনি কবে ছেলে দেখতে যাবেন বলুন।

রমেশবাবু তো আশাকে চেনেন না। যাই হোক, মেয়েদের দোষ দিয়েই এক্ষেত্রে মর্যাদা রক্ষা করা গেলো। রমেশবাবুরা বিদায় নিলেন।

আশার উপর আমরা সবাই এত রেগেছি যে, কেউ তার সংগে কথাও কইলুম না; আশার মা পর্যন্ত না।

খানিকক্ষণ পরে দেখি আশা আস্তে আস্তে গিয়ে তার বাবার ঘরে ঢুকলো। রায়বাহাদুর ইজিচেয়ারে শুয়ে গড়গড়া টানছিলেন। আশা তাঁর মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কি কথা হয় শুনবার জন্যে আমরা দু'তিনজন জানালার কাছে আড়ি পাতলুম। দেখি, চোখের জল মুছে আশা বলছে—তোমাকে বড় দুঃখ দিলুম বাবা। কিন্তু কি করবো, কেন তোমরা আমাকে এমন অবস্থায় ফেলো? রায়বাহাদুর আশাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাকে কাঁদতে দেখে নিজের অপমানের কথা ভুলে গিয়ে তখুনি তাকে কোলে টেনে নিলেন।

আশা খানিক কেঁদে মুখ মুছে বললে—বিয়ে আমার কেন দিতে চাও বাবা। বিয়ে না হ'লে কি মানুষ বাঁচে না?

রায়বাহাদুর বললেন—আমরা বুড়ো হয়েছি মা; আর ক'দিন বাঁচবো? তোকে তাই একটি ভাল ছেলের হাতে দিয়ে যেতে চাই, যাতে তোর সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

—আমার সম্বন্ধে চিন্তার কি আছে বাবা? আমাকে কেন এতো দুর্বল মনে করো? অমি নিজের ভার বহন করতে যথেষ্ট সক্ষম, সে কথা কেন ভুলে যাও বাবা।

রায়বাহাদুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—বেশ মা, তোর বিয়ে দেবার আর আমরা চেষ্টা করবো না।

আশার মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। সে বললে—তার চেয়ে বাবা, যে দশ-বারো হাজার টাকা আমার বিয়েতে খরচ করবে ভাবচো, সেই টাকাটা আমায় দাও দেখি? আমি ঐ টাকা দিয়ে একটা গোশালা করি।

—গোশালা কি হ'বে রে?

—দুধ হবে, ঘি হ'বে মাখন হ'বে—দেশের লোক খেতে পাবে, আর আমিও পয়সা পাবো—গরীব ছেলেদের বিলোবো।

রায়বাহাদুর একটু হেসে বললেন—আচ্ছা, তাই করিস।

অতঃপর আশার বিয়ের সমস্ত কথাই বন্ধ হয়ে গেলো। কেউ সে-সম্বন্ধে কোন কথা পাড়লে রায়বাহাদুর থামিয়ে দিতেন।

আমার বহুদিনের স্বপ্ন, আশার খুব ভাল ঘরে বিয়ে হোক, আশা রাণী হোক, রাণী হবার সব যোগ্যতা ওর আছে। আবার ভাবতুম, রাণী হয়ে কি হবে? তার চেয়ে আশা ভারতের নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুক, জগৎবরেণ্য হোক, বিয়ে না হয় নাই করলো—কত কি-যে তার সম্বন্ধে কল্পনা করেছি ভেবে ঠিক করতে পারিনা। আশার সম্বন্ধে কেন এত চিন্তা আমার হয়? আমি কি তাকে ভালবাসি? ভালবাসি—নিশ্চয়ই, সে ভালবাসার মধ্যে এতটুকু কামনার স্ফুলিঙ্গ নেই, একবিন্দু অপবিত্রতা নেই।

*　　*　　*

সেদিন বড় বৌদি'র খোকার জন্মদিনের নিমন্ত্রণ। একটু সকাল সকাল গিয়ে দেখি, আশা বড় বৌদি'র সংগে রান্নাঘরে। ছোট বৌদি' বাপের বাড়িতে আছেন। কাকীমা ব্যস্ত। দাদারা কেউ বাড়ি নেই। একা একা বসে একটা বই পড়ছি, মেজ বৌদি' এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন—একটা কথা তোমায় বলবো ঠাকুর- পো।

—বলুন।

—এখন না, যাবার সময়, মনে ক'রে শুনে যেও।

মেয়েদের কি একটা বদ্ স্বভাব। যে কথা এখন বলবে না তাই 'বলবো' বলে মনকে অনর্থক খানিক আগে থেকেই ব্যতিবস্ত ক'রে দেয়।

আশা আসতেই বললুম—জানো, মেজ বৌদি ব'লে গেলেন, কী একটা কথা আমায় বলবেন।

—ওঁর মুণ্ডু বলবেন। চলো, মা ডাকছেন। একলাটি বসে আছ কেন? এসো—

রাত্রের উৎসব শেষ হ'লে ফেরবার সময় মেজ বৌদিকে ডেকে বললুম—কি কথা, এবার বলুন তবে।

তিনি আমায় বারান্দায় ডেকে নিয়ে বসতে বললেন। তারপর খানিক আমতা আমতা ক'রে বললেন—আচ্ছা, আশাকে তুমি কি চোখে দেখো?

অবাক হ'য়ে গেলুম। আমাকে এরকম প্রশ্ন করার মানে। আমি কি কোন রকমে এঁদের অবিশ্বাসের কাজ করেছি? বললুম—কেন বৌদি,' হঠাৎ আজ এ-প্রশ্ন কেন?

—আশা কিন্তু তোমায় ভালবাসে।

—ভালবাসে?—আমায়?

—হ্যাঁ, তোমায়।

—কখ্খনো না বৌদি', কিছুতেই না। আশা কি জন্যে আমায় ভালবাসবে? আমি তার কোনরকমে যোগ্য নই। তা' ছাড়া সে জানে—আমার বিয়ে হয়েছে, স্ত্রী বর্তমান। আমাকে কেন সে ভালবাসবে বৌদি'?

—আমি জানি, সে তোমায় ভালবাসে, আর আমার বিশ্বাস, তুমিও তাকে ভালবাস।

এর চেয়ে আশ্চর্য কথা জীবনে শুনি নি। আমার মনের খবর আমি জানি না, জানে অন্য একজন!—বৌদি', আপনি ভয়ানক ভুল করছেন।

—তা' নয় ঠাকুরপো—আমি জানি। আর তুমিও যে ভালবাস, তাও আমি জানি।

বৌদি'র সংগে আর কোন কথা কইতে পারলুম না। কিছু ভাল লাগলো না, মেসে চ'লে এলুম।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, সত্যি কি আশা আমাকে ভালবাসে? কখনো তার ব্যবহারে তো সে রকম কিছু দেখি নি? কেন সে আমায় ভালবাসবে? কি আমার আছে যা' আমি তাকে দিতে পারি? না, বৌদি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন।

আমিও নাকি আশাকে ভালবাসি, বৌদি বললেন। এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও তো শুনি নি। আমি তাকে ভালবাসি? নিজেকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখতে লাগলুম, কোথাও যদি আশার উপরে কিছু —হ্যাঁ, ভালই তো বাসি। আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠছে কেন? কেন আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে যাচ্ছে? কোথায় ছিল এ ভালবাসা অন্তঃসলিলা নদীর মত? আশ্চর্য হ'য়ে গেলুম। নিজের অজ্ঞাতে কখন তাকে ভালবেসেছি, কখন তার ছবি মনের পরদায় আঁকা হ'য়ে গেছে, কিছুই জানি না। বৌদি' না বললে আরও কতদিন যে নিজের কাছেই নিজের এ ভালবাসা গুপ্ত থাকতো, কে জানে? হ্যাঁ, স্বীকার করতে বাধা নেই আর। আশাকে আমি ভালবাসি, সত্যিই ভালবাসি, নিজের চেয়ে ভালবাসি।

।কন্তু সে কেন আমায় ভালবাসবে? তার জীবনে যে বহু সম্ভাবনা রয়েছে।

সে তার অমন সুন্দর জীবনটা আমাকে ভালবেসে নষ্ট ক'রে দেবে—এ তো হ'তে পারে না। না, তাকে ভুলবার সুযোগ দিতে হ'বে, দিতেই হ'বে। যদিও সে আমায় ভুলে গেলে আমি সব থেকে বেশী দুঃখ পাবো, তবু তার আমাকে ভোলা চাই-ই। আমাকে ভোলা ছাড়া তার অন্য উপায় তো নেই।

উপায় আর কিছুই নেই। আমার যা' হয় হবে, আশা আমাকে ভুলে যাক।

পরদিন অফিসে গিয়ে ম্যানেজারকে বললুম—আমার শরীরটা কিছু দিন থেকে খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। গরীব মানুষ, পয়সা খরচ ক'রে তো আর চেঞ্জে যেতে পারি না, যদি দয়া ক'রে আমাদের পুরী ব্রাঞ্চে আমাকে ট্রান্সফার করেন।

ম্যানেজার রাজি হ'য়ে বললেন—বেশ, কবে যেতে চান?

—আজিই যাবো।

বাক্স-বিছানা বেঁধে পুরী চলে গেলুম। রায়বাহাদুরকে লিখে দিয়ে গেলুম—অফিসের কাজে পুরী যাচ্ছি, গিয়ে চিঠি লিখবো।

আশাতে আমাতে আজ দৈহিক ব্যবধান তিনশ' দশ মাইল—কিন্তু মনে?

সতী শ্রী

ঢেঁকীশালে বসিয়া রমা মাথার চুলগুলা খুলিয়া দিল। শীতের অপরাহ্ন হলুদ রং-এর রোদটুকু আসিয়া মুখে পিঠে পড়িতেছে; বেশ আরামপ্রদ। কিন্তু এখনও যে অনেক কাজ বাকি। আরাম ভোগ করিবার কি যো আছে!

একধামা চাউল লইয়া রমা বসিয়াই আছে। ভবী বাগ্‌দিনীর আসিয়া 'পাড়' দিবার কথা। রমা চাউলে হাত বুলাইয়া লইবে। তা' বেলা শেষ হইয়া আসিল, ভবীর আর দেখা নাই। পোড়ামুখী মরিয়াছে নাকি!

কিন্তু রোদটুকু কি মিষ্টই না লাগিতেছে! চুলগুলাও একটু শুকাইয়া বাঁচিল! সারাদিন কাজের ঝঞ্ঝাটে কি চুল শুকাইবার সময় পাওয়া যায়! খালি কাজ, কাজ আর কাজ! মুখ পোড়ার ঘরে কেবল খাটিতেই আসিয়াছিল আর কি! কি সুখই-বা আছে! পেটের একটা ছেলে নাই। টাকাকড়ি গহনাপত্র কিছুই নাই, এমন কি একটা শৌখিন জামা-কাপড়ও নাই। নিতান্তই দরিদ্র গৃহস্থ ঘরে রমা পড়িয়াছে। চাষে কিছু চাউল হয় এবং স্বামী গ্রামে পাঠশালি করিয়া মাসিক সাড়ে সাত টাকা নগদ ঘরে আনেন। ইহাতেই বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে। বেশ কিন্তু।

রমার বাপের বাড়িতে এই শীতের দিনে খাওয়া-দাওয়ার কি ধুম! রোজই ভোজ লাগিয়াই আছে যেন। শীতের দিনে সেখানে নিত্য নূতন রুচিকর খাবার তৈরী হয়। আর এখানে! সেই ভাত, কলাই-এর ডাল আর খাড়াবড়ি। নিত্য সেই একই ব্যবস্থা। চমৎকার!

ভাবিতে ভাবিতে রমা কখন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। একটা খেঁকা কুকুর আসিয়া চাউলগুলি চাটিতে লাগিল। কতক্ষণ সে

চাউল খাইত বলা যায় না, ভবী আসিয়া দূর দূর করিয়া কুকুরটাকে তাড়াইয়া দিয়া ডাকিল,—বৌমা—।

রমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেছে।

আহা-হা! চা'লগুলো সব খেয়ে দিয়ে গেল গো!—ভবী বলিল। রমা করুণনেত্রে চাহিয়া রহিল চাউলের চ্যাঙ্গারীটার দিকে। মুখে তাহার বাক্য নাই। ভবী অবশিষ্ট চাউলগুলি ঢেঁকীর মুখে ঢালিয়া দিয়া ঢেঁকীর পিছনে গিয়া উঠিল। রমা চাউলগুলি হাত দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া দিতে লাগিল।

পরন্ত রোদে রমার মুখ জ্বলিতেছে। রূপের লাবণ্যে তার প্রখর দীপ্তি। ভবী চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল আর ভাবিতেছিল, অনেক বউ-ই তো অনেক শহর হইতে এই গ্রামে আসিয়াছে, কিন্তু এমন পরিপূর্ণ রূপ আর কাহারও নাই। এতটা বয়স হইয়াছে,—এখনও কী সুন্দর। কিন্তু সবই নিষ্ফল, যদি উহার সন্তান না হয়!

—বৌমা!

রমা চমকিয়া চাহিল—কি-রে?—

—চরপুকুর গাঁয়ে এক গোঁসাই আছেন, তেনার কাছে পূজো দিলে নির্ঘাৎ ছেলে হয়;—একদিন যাবে বৌমা?

—চরপুকুর? কোথায় সে,—কতদূর?

—কোশ তিন হবে। একটু বাত থাকতে যদি পায়ে হেঁটে যাই তো ন'টা নাগাদ পৌঁছাব। পূজো-টুজো সেরে ফিরতে সন্ধ্যে লাগবে। তা' একটা দিন একটু কষ্ট করনা বৌমা—

—তুই ঠিক জানিস ভবী? সেখানে গেলে ছেলে হয়?

—কত লোকের হোল বউমা,—এই, আমারই ননদ কাদু—পূজো দিয়ে এলো আশ্বিন মাসে, তা' এই তিনমাস চলছে·····

—আচ্ছা, দেখি ওঁকে বলে—

—আজই বোলো তাহলে, পরশু মঙ্গলবার আছে—

রাত্রে খাওয়া সারিয়া খুদিরামের একটু বাহিরে যাওয়া অভ্যাস।

[illegible] পড়িয়া সে তখানে নামিয়াছে, রমা ডাকিল,—ওগো, শোন! খুদিরাম উঠিয়া আসিল—কি?

—আচ্ছা যাও, একটু শীগ্‌গীর ফিরে এসো, তখনই বলবো।

—কেন, এখনই বলনা—

—না, এখন থাক—

রমা রান্নাঘরে ঢুকিল। খুদিরাম একটু আশ্চর্য হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, পরে বাহির হইয়া গেল।

স্বামীকে কথাটা বলিতে রমার লজ্জা করিতেছে! সন্তান অবশ্যই চাই, তাহারও স্বামীরও। কিন্তু ভবী বাগ্দিনীর সঙ্গে কোন এক গ্রামে গিয়া পূজা দিতে হইবে, ওষুধ খাইতে হইবে, তবে হইবে সন্তান! হইবে কি না কে জানে! স্বামী হয়তো হাসিয়াই উড়াইয়া দিবেন কথাটা; লাভের মধ্যে রমার লজ্জা পাওয়াই সার হইবে।

রমা ভাবিয়া কূল পাইল না।

আড্ডা ঘুরিয়া খুদিরাম ফিরিয়া আসিল। রমা বিছানায় বসিয়া বালিশ শেলাই করিতেছে; ছোট একটি বালিশ, হাতখানেক লম্বা, পাশের বালিশ। খুদিরাম সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, অতটুকু বালিশ দিয়ে কি করবে রমা?

জবাব যেন রমা ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল, বলিল—তোমার ফতুয়া করে' এই টুকরোটুকু বেঁচেছিল, তাই একটা বালিশ করে নিচ্ছি, যদি কখনো দরকারে লাগে—

শেষের দিকের স্বরটা এতই অর্থপূর্ণ যে খুদিরাম তাহার ব্যথা কোন্‌খানটায়, তখনই ধরিয়া ফেলিল, বলিল—এখনো আশা কর তাহ'লে—?

রূঢ় আঘাত! রমা মুখ তুলিল না অনেকক্ষণ।

ফতুয়া খুলিয়া খুদিরাম শুইয়া পড়িয়াছে, মাথা অবধি লেপে ঢাকা।

বালিশটা আর শেলাই হইল না। রমা আস্তে আস্তে উঠিয়া ঘরে খিল দিয়া বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

—আশা করবার সময় কি আর নেই বলছো?

খুদিরাম লেপ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। রমার মুখখানি অতিশয় ম্লান হইয়া গিয়াছে।

খুদিরামের যেন একটু বেদনা বোধ হইল। রমাকে কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া বলিল—না না, আমি ঠাট্টা করছিলাম। তোমার চেয়ে কত বুড়ীর ছেলে হলো, তোমার আর কত বয়েস, সাতাশ আটাশ না হয়। আমারই মামীমার প্রথম ছেলে হয় একত্রিশ বছর বয়সে, তারপর মা ষষ্ঠীর কৃপায় এখন আমার মামাতো ভাইবোন দেড় গণ্ডা।

কথাটায় রমার যে কি হইল, কে জানে, সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল; খুদিরাম অনেক করিয়াও তাহাকে সহজে থামাইতে পারিল না; যখন রমা থামিল তখন খুদিরাম ঘুমে এতই কাতর যে তাহাকে কিছু বলিলেও কানে যাইবে না।

দিন আর কাটিতে চাহে না। সমস্ত দিন একলাটি বসিয়া কি আর ভাল লাগে! খুদিরাম তো সকাল বেলাই পাঠশালায় যায়, ফিরিয়া আসে বারোটায়। খাওয়ার পর ঘণ্টা দুই ঘুমানো অভ্যাস। আবার তিনটায় পাঠশালা। সমস্ত দিন রমার একলা কাটে। থাকার মধ্যে আছে বহুকালের পুরানো পাতাছেঁড়া একটা রামায়ণ, তাহারও আবার পঞ্চাশ পাতার পর নিরানব্বই পাতা বাহির হইয়া পড়ে—এমনি অবস্থা। পাড়ার লোক? হ্যাঁ, তাহারা তো আসে শুধু রমাকে বন্ধ্যাত্বের বিদ্রূপ শুনাইতে। রমার তাহাদিগকে প্রয়োজন নাই।

ভবী বাগ্দিনী একটা খবরের কাগজের ঠোঙায় করিয়া মশলা আনিয়াছে। মশলাটা ঘরে তুলিয়া রমা ঠোঙাটা খুলিয়া পড়িতে বসিল। অলংকারের বিজ্ঞাপন, নূতন বই-এর তালিকা, সিদ্ধ মকরধ্বজ—জন্ম-শাসন। রমা এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া গেল। জন্ম-শাসন অর্থাৎ সন্তান না হইবার ফন্দি। আর সন্তান হইবার? উহাদের

হাতে কি সন্তান লাভ করিবার কোন উপায় নাই? কে জানে! কি আশ্চর্য, কেহ সন্তান না হওয়ার দুঃখে পাগল, কেহ বা চায় সন্তান-জন্ম বন্ধ করিতে। রমার যদি দশটি সন্তানও হইত, সে কখনও জন্মনিরোধের চেষ্টা করিত না, এগারোটিকেও সমান স্নেহে বুকে তুলিয়া লইত। কিন্তু কী অদৃষ্ট!

রমা বাপের বাড়িতে বই-এ পড়িয়াছে শিশুর জন্য নারী-মনের প্রবল আকাঙ্ক্ষার কথা। তখন ভাবিত কথাটা অতিরঞ্জিত। আজ কিন্তু মনে হয়, সেই বইগুলো হাতের কাছে পাইলে আর একবার পড়িয়া দেখিত, তাহার মনের সহিত কতখানি মেলে!

একটা ফৌজদারী মামলার সাক্ষী হইয়া খুদিরাম রাত তিনটার সময় উঠিয়া শহরে রওনা হইয়া গেল। ভবী বাগ্দিনী রমাকে আগলাইয়া থাকিবে বাকি রাতটুকু। সন্ধ্যা সাতটার ট্রেনে খুদিরাম ফিরিবে। খুদিরামের যাওয়ার পরই রমা ভবীকে ডাকিল—ভবি—

—কি বৌমা, কি বলছো গো?

—আজ সেই চরপুকুরের গোঁসাইয়ের কাছে গেলে হয় না?

—তা' হয় বই কি মা—যাবে? হেঁটে যেতে পারবে তো?

—খুব পারবো—

পনের মিনিটের মধ্যেই উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল। মাইল দুই আসিয়াই রমার পা দুটি অবশ হইয়া পড়িতে লাগিল। শুধু মনের জোরে কতক্ষণই-বা হাঁটা যায়? পথের পাশে একটা পুকুর দেখিয়া দুজনে সেখানে হাত-মুখ ধুইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার উঠিল। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রমা যখন চরপুকুরের গোঁসাইতলায় আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহাকে আর চেনা যায় না। রৌদ্রে ও পথশ্রমে মুখখানি কালো হইয়া গিয়াছে। হাঁটু অবধি ধূলায় পা দুটি আচ্ছন্ন। পরনের কাপড়খানিও ধূলায় মলিন হইয়া গিয়াছে।

প্রকাণ্ড একটা বটগাছের তলায় গোঁসাইপ্রভুর আস্তানা। পূজারী সম্মুখে বসিয়া হোম করিতেছে। কত সন্তানলাভেচ্ছু নারী চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে তাহার সংখ্যা নাই। যাহাদের মানত

করিয়া সন্তানলাভ হইয়াছে তাহারাও আসিয়াছে দেবতার ঋণ শোধ করিবার জন্য। কাঠের ও মাটির ঘোড়া, সোনার বিল্বপত্র, রূপার বাটি-গেলাস, এই সব দিয়া মানত শোধ করিতে হয়। সোনারূপার জিনিসগুলি পূজারী লইয়া যায়, কাঠের ও মাটির ঘোড়াগুলি বটবৃক্ষের চারিদিকে সাজাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে অসংখ্য ঘোড়া সেখানে জমা হইয়া গিয়াছে। শোনা যায়, গভীর রাত্রে নাকি গোঁসাইবাবা ঘোড়ায় চড়িয়া ভ্রমণ করেন। সেই সময় তাঁর এলাকার মধ্যে কেহ থাকিলে তাহার বিপদ অনিবার্য। কোনদিন কেহই এই বৃক্ষতলে রাত্রিবাস করিতে সক্ষম হয় নাই। দু'একজন দুঃসাহসী সাধু নাকি দু'একবার এখানে রাত্রিবাসের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মধ্যরাত্রে বাবা নাকি স্বয়ং আসিয়া তাহাকে চিমটার দ্বারা মারিতে মারিতে সীমানার বাহির্গত করিয়া দেন।

রমা বাবার অসংখ্য কীর্তিগাথা শুনিল সহযাত্রিনীদের নিকট। তাহার ভক্তি বিশ্বাস শতগুণে বাড়িয়া গেল। গলায় আঁচল জড়াইয়া সে মাটিতে মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া বলিতে লাগিল,—হে ঠাকুর। একটি পুত্র—তা যদি নাই দেবে তবে একটি কন্যাও যেন আমাকে দিও। আমি যথাসাধ্য তোমার পূজা দিব।

পূজারীর হোম শেষ হইল। এইবার তাঁহার 'ভর' আসিবে। অর্থাৎ গোঁসাইবাবা পূজারীর স্কন্ধে উঠিয়া কিছুক্ষণ নৃত্য করিবেন। এইটিই মহেন্দ্রক্ষণ ; যাহার যাহা প্রার্থনা এই সময় বলিলে গোঁসাই-বাবা পূজারীর মুখ দিয়া বলিবেন, প্রার্থনা সফল হইবে কি না।

'ভর' আসিলে অন্য সকলের মত রমাও সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিল ; গোঁসাইবাবা পূজারীর মুখ দিয়া তাহাকে বলিলেন—গত জন্মে তুমি আক্রোশবশে সপত্নী-সন্তান হত্যা করেছ, তাই এজন্মে সন্তান হচ্ছে না।

রমার সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।—তবে উপায় ?

—উপায় আছে। যদি প্রতি মঙ্গলবার সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সন্ধ্যায় তিন বালগোপালকে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করানো যায়

এবং জগতের সমস্ত বালক-বালিকাকে নিজ সন্তানদের ন্যায় স্নেহ-চক্ষে দর্শন করা যায় তবে পূর্বজন্মের সেই পাপ খণ্ডন হইতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্বে গোঁসাইবাবার নির্মাল্য মাদুলিতে করিয়া গলায় রাখিতে হইবে ও মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে সাধ্যানুসারে পূজা দিবার মানত করিয়া আশীর্বাদ লইতে হইবে।

রমা স্বীকৃত হইয়া গলায় মাদুলী ঝুলাইয়া যখন বাড়ির পথ ধরিল, বেলা তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাহার মনের ভিতর একটা চিন্তা কেবলই ঘুরিতেছিল, খুদিরাম গৃহে পৌঁছিবার পূর্বে যদি সে না পৌঁছিতে পারে তবে কী হইবে! রমা যথাসম্ভব সত্বর চলিতে লাগিল।

মাইল দুই আসিয়াই একটা গ্রাম। তাহার মধ্য দিয়াই রমাদের যাইতে হইবে। রমা গ্রামের লোকেদের বাড়ির দিকে তাকাইতে তাকাইতেই চলিল। কোথাও ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে, কোথাও-বা রাখাল গরু বাঁধিতেছে, কোথাও-বা বধূ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়া তুলসীতলায় প্রণাম করিতেছে। ইহার মধ্যে বৈচিত্র্য কিছুই নাই, তবুও রমার খুব ভাল লাগিতেছিল। গতি তাহার মন্থর হইয়া আসিতেছে ক্রমেই। ভগী পিছন হইতে বলিল—চলনা বৌমা, রাত হয়ে যাবে যে—।

রমার যেন তন্দ্রা ভাঙিল। এত জোরে সে হাঁটিতে লাগিল যে কোন মেয়ে সেরূপে রাস্তায় হাঁটে না, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে।

পথের পাশের একটা দোকান হইতে একটি পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে কেরোসিন তেলের একটি বোতল লইয়া বাহির হইল। রমার দুর্ভাগ্য; তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া সে ছেলেটির গায়েই আসিয়া পড়িল। ছেলেটি পড়ে নাই কিন্তু তেলপূর্ণ বোতলটি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। সে কাঁদিয়া উঠিল।

রমা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল এবং স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল,—কেঁদোনা বাবা, তোমার তেল আবার আমি কিনে দিচ্ছি।

ছেলেটি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কি যে দেখিল, সেই

জানে, সে কিন্তু এক মুহূর্তেই চুপ হইয়া গেল। রমা তাহাকে লইয়া দোকানের ভিতর আসিয়া বলিল—এক বোতল তেল দিন—

ভদ্রঘরের মেয়ে রমা, দোকানে এইরূপে কখনও কিছু কেনে নাই, সংকোচ তাহার যথেষ্টই হইতেছিল—কিন্তু সমস্ত সংকোচ সবলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে তেল কিনিল ও দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল ছেলেদের জন্য কিছু খাবার পাওয়া যাইবে কিনা।

দোকানী বলিল, মুড়ি, ছোলাভাজা ও বাতাসা ছাড়া তার আর কিছুই নাই। অগত্যা রমা তাহাকে এক পয়সার ছোলা ভাজা ও এক পয়সার বাতাসা কিনিয়া দিয়া কোলে লইয়া হাঁটিতে লাগিল।

খানিক আসিয়াই সে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমাদের বাড়ী কোথায়ে খাকা?

অদূরে একটা বাঁশঝাড়ের দিকে আঙুল দেখাইয়া ছেলেটি বলিল, ঐ যে—

রমা বাঁশঝাড়টার কাছে আসিয়া দেখিল, ছোট্ট একখানি কুটীর। ছেলেটি দৌড়িয়া উঠানে গিয়া ডাকিল, বাবা—বাবা—রাধারাণী মা—

—সে আবার কি রে?

—দেখ এসে—

ফোঁটাতিলকধারী এক ব্যক্তি বাহিরে আসিল; দেখিলেই বোঝা যায়, বৈষ্ণব।

রমাকে দেখিয়া সে বলিল—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

রমা সংক্ষেপে ঘটনা বলিল।

ছেলেটি আসিয়া ততক্ষণে আবার রমার আঁচল ধরিয়াছে। বলে, বসো রাধারাণী মা—

নামটি নিশ্চয়ই তাহার বাবার কাছে শেখা।

রমা কি যেন মায়ার বন্ধনে পড়িয়া গেল। চলিয়া গেলে ছেলেটি কাঁদিবে, এই চিন্তাই তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল।

রমা ছেলেটিকে কোলে লইয়া শুধাইল—তোমার নাম কি বাবা?

নবগোপাল।

—বেশ মিষ্টি নাম, কে দিয়েছে? তোমার বাবা?

—হুঁ।

ছেলেটিকে কোলে লইয়া তাহার মাথাটিকে কাঁধের উপর চাপিয়া ধরিয়া রমা তাহাকে দোলাইতে লাগিল।

এক মিনিটের মধ্যে তাহার কত কথা মনে হইতে লাগিল। নিজের সন্তান হইলে সে তাহাকে এমনই করিয়া দোলাইয়া দোলাইয়া ঘুম পাড়াইবে। ছেলেবেলার শেখা ছড়াগুলি তখন তাহার কাজে লাগিবে। খোকা ঘুমাইতে ঘুমাইতে হয়তো ডাকিয়া উঠিবে—'মা'—তখনি রমা তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া—

রমা মাথা নোয়াইয়া গোঁসাই প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।

গোপীচরণের বাড়িতে সে ও নবগোপাল ছাড়া আর কেহ নাই। নবগোপালকে তিন বৎসরের রাখিয়া তাহার মা হরিপ্রিয়া বৈষ্ণবী বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। তদবধি গোপীচরণ একাই নবগোপালকে মানুষ করে মাতা ও পিতার যত্নে। মনে মনে কতবার তাহার ইচ্ছা হয়—তেমনি আর একটি বৈষ্ণবী যদি পাওয়া যায়, নবগোপালকে তাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া গোপীচরণ একটু হরিণাম করিতে পারে। কিন্তু আজিও কেহ জুটিয়া উঠে নাই।

গোপীচরণ ছেলেটিকে যেমন ভালবাসে তেমনি প্রহার করে। এইটুকু ছেলে দোকান হইতে জিনিস আনিতে একটু দেরী হইলে আর নিস্তার নাই। গোপীচরণ তাহার পিঠে পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ বসাইয়া দেয়। তবুও ঐ ছেলেটি তাহার একমাত্র অবলম্বন, যাহার জন্য বাহিরে গেলে ক্ষণে ক্ষণে মনটা উতলা হইয়া উঠে। বাহিরে তো তাহাকে যাইতেই হইবে নতুবা দিন চলিবে কেমন করিয়া। চলিবার উপায় তো শুধু ভিক্ষা। গোপীচরণ পাড়ার কোন গৃহস্থের বাড়িতে নবগোপালকে রাখিয়া ভিক্ষায় যায়। দুই দশ বাড়ি ঘুরিয়া দিন চলিবার মত কিছু পাইলেই ফিরিয়া আসে। প্রথম প্রথম নবগোপালের জন্যে বড়ই মন কেমন করিত, বেশীক্ষণ সে বাহিরে

থাকত না। এখন সে একটু বড় হইয়াছে, তাই গোপীচরণ এখন সারাদিন নিরুদ্বেগে ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি ফেরে।

আজ নবগোপালকে তেল আনিতে দিয়া সে ঘরের ভিতর তাহার ভিক্ষার ঝুলি, একতারা ও আলখাল্লা রাখিতেছিল, এমন সময় আসিল রমা।

পুত্রস্নেহবিহ্বলা জননীর মত রমার মূর্তি গোপীচরণকে যেন আশ্বস্ত করিল।

গোপীচরণ ভাবিল, ইহার কাছে যদি নবগোপালকে রাখিয়া দেওয়া যায় তবে তাহার সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার উপায় কি! উনি কি নবগোপালকে লইতে স্বীকৃত হইবেন? কে জানে! ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে উনি, পথে ছোট ছেলে দেখিয়া হয়তো নারীর স্বতঃবিকশিত স্নেহপরায়ণতা উঁহাকে এখানে আনিয়াছে; তাই বলিয়া কে আর একটা ছেলে পুষিবার ঝক্কি গ্রহণ করে!

ভবী বলিয়া উঠিল, রাত হয়ে যাচ্ছে বৌমা, চলো। গোপীচরণ যেন কথা খুঁজিয়া পাইল, বলিল—কোথায় যাবেন আপনারা?

রমা সংক্ষেপে বলিল—পলাশফুলি।

ওঃ! বলিয়া গোপীচরণ আবার চুপ হইয়া গেল। একটু পরেই কি যেন ভাবিয়া বলিল—কিন্তু এখনো দেড়ক্রোশ রাস্তা, এই রাত্তিরে কি করে যাবেন?

—তা যেতে পারবো, জ্যোৎস্না রাত—

—কিন্তু পথ খুব ভাল নয়; আচ্ছা, আমি না হয় একটু এগিয়ে দিয়ে আসছি—

রমার বেশ ভালই লাগিল। লোকটা তাহার ছেলের প্রতি এইটুকু স্নেহ দেখানোতেই কতখানি কৃতজ্ঞ হইয়াছে! বলিল, বেশ তো বাবা, তোমার যদি কষ্ট না হয়;—কিন্তু খোকাকে কার কাছে রেখে যাবে?

গোপীচরণ বলিল, ও এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে। সারাদিন দৌড়ে-ছুটে বেড়ায়, সন্ধ্যা হতেই ঘুমিয়ে পড়ে।

সত্যিই দেখা গেল, রমার কোলে নবগোপালের চোখ দু'টি বুঁজিয়া আসিতেছে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। তাহাকে শোওয়াইয়া দিয়া রমা বাহির হইল। গোপীচরণ লাঠি লইয়া আগে আগে চলিতে লাগিল।

গ্রামের বাহিরে আসিয়া রমার মনে পড়িল, নবগোপাল কিছু না খাইয়াই ঘুমাইয়াছে। গোপীচরণকে বলিল—খোকা যে কিছু খায়নি, ওর খিদে পাবে না?

গোপীচরণ বলিল, রোজ রাত দশটার সময় সে ভাত রান্না করিয়া তাহাকে উঠাইয়া খাওয়ায়, আজও তাহাই হইবে।

রমা আশ্বস্ত হইল।

পথ চলিতে চলিতে গান করা গোপীচরণের একটা মুদ্রাদোষ। আগে আগে যাইতে যাইতে সে গুন গুন করিয়া সুর ভাঁজিতেছিল। অবশ্য তাহার জানা গান, সবই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, অতএব আদিরসের। কিন্তু ভদ্রঘরের বৌ-এর সহিত যাইতে যাইতে গান করা উচিত কি অনুচিত, সে জ্ঞান গোপীচরণের নাই।

সে তো বাড়িতে বাড়িতে গান করিয়া ভিক্ষা করে।

রমা কিন্তু একটু বিরক্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে সে গোপীচরণকে বলিল—গান কোরোনা বাবাজি, ফেরবার সময় গাইবে।

গোপীচরণ চুপ করিল, কিন্তু রমার কণ্ঠস্বর তাহাকে আহত করিল।

অতঃপর চুপচাপই তাহারা চলিতে লাগিল। মেঠো ফুলের গন্ধে সমস্ত রাস্তার হাওয়া ভারাক্রান্ত। সংকীর্ণ পথের উপর পাশের ঝোপের ডাল আসিয়া বাধা জন্মাইতেছে। রাস্তার বাঁকে বাঁকে গোপীচরণ অদৃশ্য হইয়া যায়; একটু দাঁড়ায়, রমা ও ভবী বাঁকটি পার হইলে তবে গোপীচরণ চলিতে থাকে। এমনি করিয়াই দীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত হইল। পলাশফুলি গ্রাম দেখা যাইতেছে।

গোপীচরণ বলিল—তাহ'লে ঠাকরুণ, আমি এবার যাই—

লোকটাকে এতদূর আনিয়া খোকাকে কিছু না দিয়াই বিদায়

করিয়া দিতে রমার কেমন কেমন বাধ বাধ ঠেকিল; বলিল, বাড়ি অবধি চলনা বাবাজি, খোকার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসবে।

গোপীচরণ আর আপত্তি করিল না।

বাড়ির দরজার কাছে আসিতেই রমা দেখিল উঠানে অনেক লোক। তাহাদিগকে দেখিয়াই কে একজন বলিয়া উঠিল—চুপ, চুপ, আসছে—

ব্যাপার কিছু না বুঝিয়াই রমা বিস্মিত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখিল, খুদিরাম একপাশে পেয়ারা গাছটার তলায় দাঁড়াইয়া আছে। উঠানে গ্রামের প্রায় সমস্ত মুরুব্বিরাই সমাসীন।

রমাকে দেখিয়াই এক ব্যক্তি বলিল, কি গো, ফিরলে যে? বাবাজি বুঝি রাখতে সাহস করলে না? মারের ভয় তো আছে!

রমা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে কোথায় গিয়াছিল তাহারই একটা কৈফিয়ৎ সে দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু এত লোকের সাক্ষাতে কথা তাহার ফুটিল না।

খুদিরাম আগাইয়া আসিয়া রমার চুলের মুঠি ধরিয়া বলিল—হারামজাদি, তোর মনে এতো ছিল। বাক্স ভেঙে টাকাগুলো নিয়ে রাতারাতি পালিয়ে ভেবেছিস, কেউ আর ধরতে পারবে না। হারামজাদী নষ্ট চরিত্রা—!

খুদিরাম রমার চুল ধরিয়া প্রচণ্ড ঝাঁকি দিল।

রমা ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া বলিতে গেল, আমি গিয়েছিলাম গোঁসাইয়ের কাছে পূজো দিতে ছেলের জন্যে—

গ্রামের মণ্ডল বাধা দিয়া বলিলেন, সব জানি গো বাছা, সব জানি। টাকাগুলো কিনা শেষে গোপী বৈরাগীকে দিয়ে এলে? তা তার কাছে যাবারই যদি তোমার ইচ্ছে ছিল তা শুধু হাতেই তো গেলে চলতো বাছা! আবার গেলেই যদি তো আমাদের লজ্জা দিতে ফিরেই বা এলে কেন?

অন্য একজন বলিল, গোপীর বাপের সাধ্যি ওকে রাখতে পারে

ওখানে। তাই আজ পাঠিয়ে দিয়েছে, সুযোগ বুঝে আর একদিন কোথাও দূর গাঁয়ে নিয়ে যাবে, আর কি।

রমা বুঝিল, তার নামে কলঙ্ক রটিয়াছে। কিন্তু গোপীচরণ তো সংগেই ছিল, কই সে?

পলাইয়াছে—কাপুরুষ, কিন্তু ভবী—

রমা চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল ভবীকে কোথাও যদি পাওয়া যায়। না, ভবী পলাইয়াছে। কে তবে তাহার হইয়া সাক্ষ্য দিবে? ব্যাকুলা রমা একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, বলিতে গেল—আমি—আমি—

খুদিরাম তাহাকে লাথি মারিতে মারিতে দরজার বাহিরে ফেলিয়া দিল। রমা আর কোন প্রতিবাদ করিল না, সমস্তই সহ্য করিল।

পরদিন সকালে দেখা গেল, নিকটবর্তী পুকুরে রমার মৃতদেহ ভাসিতেছে। গলায় তামার সেই মাদুলী, আঁচলের কোণে দেবতার নির্মাল্য।

—

রূপান্তর

হরিশবাবু আজ চার পাঁচ দিন বাহির ·
চাপ একটু বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাই ডাক্তার ব।..
আর তিনি থাকিতে পারিতেছেন না, তাঁহার অশোক
দেখিবার জন্য—তাঁহার বনমল্লিকাটির ফুলকুঁড়িগুলি, ফোটার উৎসবে
যোগ দিতে হরিশবাবু একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন।

ডাক্তার আসিতেই তিনি করজোড়ে বলিলেন, একবার বাগানে যেতে
দিন ডাক্তার বাবু, একবার অনুমতি দিন, আমি বেশ সুস্থ মনে করছি
এখন। ডাক্তার তাঁহাকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—
যেতে পারেন একবার কিন্তু বেশীক্ষণ বসে বা দাঁড়িয়ে থাকবেন না ন

—না—আমি এই যাব আর আসবো। ই

হরিশবাবু উঠিয়া পড়িলেন, সংগে চলিল বহু পুরাতন ভৃত্য মদন।

বাড়ি হইতে বাগান একটু দূরে। শ্রাবণ মাসের পল্লীপথ কর্দমাক্ত
পিচ্ছিল, কিন্তু হরিশবাবুকে আজ আর কে বাধা দিতে পারে। তিনি
চলিলেন।

মেয়ে মিনু ডাকিয়া বলিল, কোথায় যাবে বাবা? হরিশবাবু হাত
উঠাইয়া বলিলেন,—আসছি।

হরিশবাবু ষাট বছরের বৃদ্ধ। যৌবনে তিনি ব্যবসায়ে প্রচুর উপার্জন
করিয়াছেন; পৈত্রিক তিন কাঠা জমির মেটে বাড়ি ছাড়িয়া প্রকাণ্ড
অট্টালিকা গড়িয়াছেন, জমিদারী কিনিয়া গ্রামের শ্রেষ্ঠ ধনী ও মানী
হইয়াছেন এবং শেষ বয়সে চাষের জমিতে স্বয়ং মোতায়েন থাকিয়া
চাষবাস ফুলফসল সাজাইয়া আনন্দে সময় কাটাইতেছেন।

আনন্দে!—লোকে তাই বলে, কিন্তু হরিশবাবু জানেন আনন্দ
কতটুকু। পৈতৃক সেই তিন কাঠা বাস্তু বাড়ি এখন হরিশবাবুর

সুরম্য উদ্যানবাটিকা, অত্যন্ত ছোট কিন্তু অত্যন্ত সুদৃশ্য ; সারাটা বছর যেন ফুলের বাজার লাগাইয়া রাখিয়াছে।

হরিশবাবু ধীরে ধীরে বাগানের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, উড়িয়া মালী ছুটিয়া আসিয়া গেট খুলিয়া দিল ; হরিশবাবু ভিতরে ঢুকিলেন।

কোন কথা না বলিয়া তিনি সটান আসিয়া দাঁড়াইলেন ছোট্ট একটা অশোক তরুর নিকট। গত বৎসর এই গাছটি তিনি কলিকাতা হইতে আনিয়া নিজের হাতে মাটি তৈয়ার করিয়া লাগাইয়াছেন। এক বছরের গাছ, যেন একবছরের দামাল শিশু—হরিশবাবু তাহাকে নাড়িয়া, তাহার চামরের মত পত্রগুচ্ছে হাত বুলাইয়া আদর করেন,—কথা বলেন।

হরিশবাবুর যেন মনে হইল, চার দিন তাঁহাকে না দেখিয়া গাছটি কত রোগা হইয়া গিয়াছে। হয়ত উহার ঠিকমত যত্ন হয় নাই, হয়ত মালী উহাকে একবারও দেখিতে আসে নাই। কিংবা হয়ত উহার শিকড়ে কোন পোকা লাগিয়াছে। না না, কিছুই উহার হয় নাই, ও শুধু হরিশবাবুকে না দেখিয়া হেদাইয়া গিয়াছে, আহা!

পাশেই বন-মল্লিকা'র লতাটি উঠিতেছে। ফুল তাহার ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহারই মধ্যে। হরিশবাবু এই অশোক ও বনমল্লিকাটি একদিনে এক সময়ে রোপণ করেন। উহাদের তিনি বিবাহ দিবেন, অশোক আর একটু বড় হইলে মল্লিকে উহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া তিনি দেখিবেন, রক্তরাঙা অশোকের বুকে তুষারশুভ্র বনমল্লীর লীলাচঞ্চল প্রণয়ালাপ।

হরিশবাবু বন-মল্লিটির দিকে চাহিয়া রহিলেন সস্নেহ দৃষ্টিতে। পিতার স্নেহ যেন তাঁর বড় বড় দুটি চোখে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে শরতের বৃষ্টিকণার মত।

হ্যাঁ, মল্লিটাও রোগা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অশোক যেন ম্লান, বেশী ম্লান! মল্লি এরই মধ্যে কিশোরী হইয়া উঠিল। সারা

অঙ্গ যেন তার যৌবনের বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ, যে কোন মুহূর্তে ঝিলিক মারিয়া উঠিবে।

হরিশবাবু সস্নেহে একবার উহার সমস্ত দেহে হাত বুলাইয়া দিলেন। বর্ষার জলে ধোয়া সুশ্যাম পাতাগুলি যেন সে-স্নেহ টানিয়া টানিয়া পান করিতেছে কচি শিশুর মাতৃস্তন্য পানের মত।

হরিশবাবু ডাকিলেন, মালী—

—হুঁজুর—

—একটা চেয়ার এখানে পেতে দে।

মালী পূর্বেই চেয়ার দিয়াছে, হরিশবাবু এতক্ষণ সেদিকে তাকান নাই।

—দিয়েছি হুঁজুর।

—আচ্ছা, যা তোরা ঐ ঘরে বোস্ গে।

মদন ও মালী চলিয়া গেল।

হরিশবাবু চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

এইখানে, যেখানে ঐ অশোক গাছটি রহিয়াছে, একদিন তিনি সেইখানেই বসিয়াছিলেন, কত বড়ই-বা তিনি তখন, ঐ গাছটির মতই সুকুমার, কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে।

আর ঐ মল্লি যেখানে রহিয়াছে, ঐখানে বসিয়াছিল ইন্দিরা, মিনুর মা ঠিক উহারই মত কিশোরী, তন্বী।

রমেশপুর হইতে তাহাকে প্রথম বাড়িতে আনিয়া প্রথম ঐখানেই তিনি বসান। তারপর মা আসিয়া বরণ করিয়া বধূ ঘরে তোলেন। সে কত সমারোহ! দরিদ্রের সংসার, তবু আনন্দের এতটুকু অপ্রাচুর্য ছিল না। মা যেন অন্নপূর্ণার মূর্তিতে সেবা করিতেছিলেন সমস্ত সংসারের।

তারপর কত কি হইল; হরিশবাবু অর্থ উপার্জনে বিদেশে গেলেন; শিশুকাল হইতে দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন অর্থের মূল্য। অবিরাম—অবিশ্রাম পরিশ্রম চলিল। বালিকা বধূর মিনতিপূর্ণ পত্রের উত্তর দেবার সময়ও তাঁহার মিলিত

না। মা বাবা একে একে বিদায় নিলেন; হরিশবাবু দুইদিনের জন্য আসিয়া শ্রাদ্ধ সারিয়া গেলেন। টাকা যেন হরিশকে পাইয়া বসিয়াছিল। বধূর বন্যার মত চোখের জল উপেক্ষা করিয়া তিনি অর্থ সংগ্রহে মন দিলেন। ইন্দিরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অভ্যস্ত হইয়া গেল হাসিতে। সে কান্না তার বুকের ভিতরেই চাপা রহিয়া গিয়াছে, বাহিরে প্রকাশের অবসর আর হয় নাই।

হরিশবাবু পিতৃঋণ শোধ করিয়া জমিজমা কিছু কিনিতে আরম্ভ করিলেন,—টাকা পাঠাইয়া দিতেন ইন্দিরাকে। ইন্দিরা ধীরে ধীরে জমি কিনিল, জমিদারী কিনিল, গ্রামের বহির্দেশে পাঁচ বিঘা জমি জায়গা কিনিয়া বাড়ি তৈরী আরম্ভ করিল; হরিশ বাবুকে লিখিল '—একটিবার এসো, লক্ষ্মটি—'

হরিশবাবু একদিন আসিয়া দেখিয়া গেলেন, তাঁহার কষ্টার্জিত অর্থ ইন্দিরার হাতে ঐশ্বর্যে পরিণত হইতেছে। ইন্দিরা গ্রামসম্পর্কে দেবর গোবিন্দ মণ্ডলের সহায়তায় এত সব করিয়াছে। আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তিনি চলিয়া গেলেন আবার অর্থার্জনে।

বাড়ি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছেন, তখন আসিল মিনু, এই মেটে ঘরে; ঐ নারিকেল গাছটা তখনো ছিল, এখনো আছে। মিনু এই বাড়িতেই জন্মিয়াছে কিন্তু মিনুর মা তাকে নিজের সমস্ত রক্তটুকু দিয়াই যেন জন্ম দিয়াছে। ইন্দিরা আর সারিল না। গোবিন্দ মণ্ডল বারংবার চিঠি লিখিল, বৌঠানের বড্ড অসুখ—শীঘ্র বাড়ি আসিবেন। কিন্তু হরিশবাবু তখন নতুন ব্যবসায়ের কন্‌ট্রাক্ট লইতেছেন, বিস্তর লাভ হইবে —তিনি আসিতে পারিলেন না, লিখিয়া দিলেন, খুব ভাল ডাক্তার দেখাও, যত খরচ হয়।

চিকিৎসা ঠিক হইয়াছিল কিনা হরিশবাবু জানেন না, কিন্তু ইন্দিরা চলিয়া গেল। বজ্রপাতবৎ হরিশবাবু যখন সেই সংবাদ শুনিলেন তখন তাঁহার কন্‌ট্রাক্ট লওয়া শেষ হইয়াছে এবং তিনি বাড়ি আসিতে প্রস্তুত হইতেছেন।

হরিশবাবু কাঁদিলেন না, কন্যাটির জন্য আয়ার ব্যবস্থা করিয়া

চলিয়া গেলেন। তারপর হইতে পাচশ বৎসর সংগ্রাম চলিয়াছে [illegible] জন্য। বিশ্রাম নাই—বিরাম নাই।

ইতিমধ্যে ইন্দিরার নতুন বাড়ি হইয়া গিয়াছে, সেখানে মিনুর আয়া মিনুকে লইয়া উঠিয়া আসিয়াছে, বিস্তর চাকর ঝি রাখা হইয়াছে, গোবিন্দ মণ্ডল ম্যানেজার হইয়াছে কিন্তু হরিশবাবু টাকাই রোজগার করিয়াছেন।

বার বৎসরে মিনুর বিবাহ দিয়া জামাইকে তিনি ঘরে রাখিয়াছেন। মিনু সুখে আছে।

কত দীর্ঘ বৎসর হরিশবাবু অর্থার্জন করিয়া এবং ভবিষ্যতের আয়ের পথ পাকা করিয়া ঘরে ফিরিয়াছেন গত বৎসর।

মিনুর পুত্রকন্যা দাদামশায়কে পাইয়া আনন্দে নাচিতেছে; মিনু বাবার সেবা করিতে পাইয়া স্বর্গসুখ অনুভব করে। কিন্তু হরিশবাবু! তাঁহার কথা আর কে ভাবিবে!

চিরজীবন কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকা হরিশবাবুর পক্ষে অসম্ভব। তিনি চাষে মনোযোগ দিলেন।

জন্মভূমির মেটে বাড়িটি তিনি পরম যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন গোবিন্দ মণ্ডলের দ্বারা। তারই জমিতে এই বাগান।

হরিশবাবু ভাবিতে লাগিলেন, ইন্দিরা তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, ইন্দিরার সহিত মিলন তাঁহার হয় নাই—কিন্তু তিনি দেখিয়া যাইবেন এই অশোক ও মল্লিকার মিলন। যদি কোন অদৃশ্য জগৎ থাকে, যদি ইন্দিরা সেখান হইতে দেখিতে পায় তবে দেখিবে, হরিশবাবুর হৃদয়েও প্রেম ছিল, হরিশবাবুও ভালোবাসিতে জানিতেন।

হরিশবাবু উঠিয়া মল্লির আগাটা লইয়া অশোকের একটা ডালে ছোঁয়াইলেন। দুটি তরুণ-তরুণী যেন লাজে-ভয়ে লুকাইয়া লুকাইয়া চুমা খাইতেছে। ইহারাই আবার দু'দিন পরে ঘরণী গৃহিণী হইয়া উঠিবে, পরস্পরকে জড়াইয়া জড়াইয়া সংসারযাত্রা চালাইয়া যাইবে। আঃ—হরিশবাবু সেই দৃশ্যটি দেখিতে লাগিলেন মনে মনে।

—হুঁজুর—

—দিদিমণি বলে দিয়েচেন, এক ঘণ্টার বেশী যেন দেরী না হয়।

স্নেহের অত্যাচার! মিনু বাপের জন্য ভাবিতেছে। কিন্তু সে কি বোঝে না, হরিশবাবুর অন্তর এইখানে আসিয়া কত তৃপ্ত হয়! ওই অশোক আর মল্লি ত' বেশ বুঝিতে পারে—মিনু কেন বোঝে না! হরিশবাবু উঠিলেন; ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

পথেই তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। মদন কোনরূপে ধরিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইল। ডাক্তার আসিয়া 'আইস-ব্যাগ' ব্যবস্থা করিলেন।

শিয়রে মিনু বসিয়া।

—বাবা—

হরিশবাবু একটু জোরে বলিলেন—হুঁ—

—বাবা, কি কষ্ট হচ্ছে?

হরিশবাবু চোখ মেলিয়া তাকাইলেন। ও কে,—ও কে বসিয়া তাহার শিয়রে? মিনু? না না—মিনু ত' ঐ উহার কোলে রহিয়াছে। ছোট এক ফোঁটা মেয়েটি—কিন্তু ও কে? ও কি মিনুর মা—?—ইন্দিরা? হ্যাঁ, সেই রূপই ত' উহাকে দেখিতে? ইন্দিরা, ইন্দিরা—

হরিশবাবু শুনিতেছেন, ইন্দিরা যেন বলিতেছে—ওগো, দেখো, তোমার মিনু কত সুন্দর হইয়াছে। দেখ, আমাকে কেমন মানাইয়াছে! ইন্দিরা হাসিতেছে, তেমনি ফুলশয্যার রাত্রির মত হাসিতেছে।

হরিশবাবু হাত বাড়াইলেন তাহাকে ধরিতে। ইন্দিরা সরিয়া গেল মিনুকে হরিশবাবুর কোলে ফেলিয়া দিয়া। মিনু খিলখিল করিয়া হাসিতেছে। ছোট্ট একটি বন-মল্লি ফুল—শুভ্র, নির্মল। ইন্দিরা বলিতেছে, আমাকে আর ধরিতে পারিবে না, আমি ঐ মল্লিলতায় মিশিয়া গিয়াছি, এসো, তুমিও ঐ অশোকের শ্যামল পত্রদলে মিশিয়া যাও। কাল দেখিবে, আমি তোমার অঙ্গে

অঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছি। আমার সারা অঙ্গে মিনুর মত শুভ্র সুন্দর ফুল ফুটিয়া উঠিবে। এস—তুমিও মিলাইয়া যাও—

আকাশে মেঘ জমিয়া উঠিল; শ্রাবণ মাস, হ্যাঁ, শ্রাবণ মাস। ঝর ঝর নামিল বারিধারা, মল্লিকে যেন জলের ঝাপটে বিচ্যুত করিতে চায় পাগল বাদল হাওয়া। মল্লি আরো জড়াইয়া যাইতেছে অশোকের গায়ে গায়ে।

প্রবল বাতাস—না, অশোক মল্লিকে বাঁচাইতে পারিল না—মল্লি কোমল ভূমিশয্যা হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িল, তবুও সে অশোকের গায়ে লাগিয়া; অশোক প্রাণপণে বুঝিতেছে, মাটির সহিত মাথা ঠেকিয়া যাইতেছে, আবার সে সোজা হইয়া উঠিতেছে; অদ্ভুত উহার রণকৌশল, অপূর্ব দক্ষতা। বাতাস পরাজয় মানিল। কিন্তু মল্লি যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। উহাকে আবার কোমল মৃত্তিকা-শয্যায় শয়ন করাইয়া সুগন্ধি বারিধারা সেবন করাইতে হইবে যে। অশোক উঠিল, প্রাণপণ বলে উঠিল, দেহের মনের সমস্ত শক্তি একত্রিভূত করিয়া অশোক মল্লিকে বিছানায় শোয়াইতে তাহাকে বুকে করিয়া উঠিল—কে টানিতেছে, না অশোক কোন বাধা মানিবে না—কোন প্রলোভনে কান দিবে না,—একবার সে মল্লিকে হারাইয়াছিল, কিসের জন্য? অর্থের জন্য। না, আর সে কিছু শুনিবে না। অশোক দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া চলিবে—

—বাবা—বাবা—

হরিশবাবু চমকিয়া উঠিলেন, মিনু তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। করুণ দৃষ্টিতে একবার চাহিলেন তার অশ্রুসজল মুখের পানে—তারপর ধীরে ধীরে বিছানায় গড়াইয়া গেলেন।

লজ্জাহীনা

প্রৌঢ় বয়সের পুত্র টুকুন!

একমাত্র কন্যা সীতা তাহাকে খুঁটিয়া মানুষ করিতেছে, জননীর স্বাস্থ্য দুর্ব্বল বলিয়া। সীতাই যেন টুকুনের মা। সকাল হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি সীতা ভাইটিকে কোলে, পিঠে, বগলে রাখিয়া সতর্ক প্রহরীর মত জাগিয়া আছে। তাহার স্কুল কামাই হয়, উপায় নাই। তাহার খেলার সাথীরা ডাকিয়া ফিরিয়া যায়, সীতা টুকুনকে লইয়া বিব্রত থাকে। আত্মভোলা দার্শনিক পিতা গৌরীশঙ্কর মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখেন দশম বর্ষীয়া বালিকার মধ্যে জগৎ-জননীর মূর্ত্তি; বিশ্ব-পালয়িত্রী যেন সীতার মধ্যে আবির্ভূতা।

টুকুনের আবদারের শেষ নাই। অধ্যাপক পিতার শশ্রু-সঙ্কুল গম্ভীর মুখ দেখিলেই সে কাঁদিয়া উঠে, স্বাস্থ্যহীনা মা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে; তাই য-া-ছু অভাব অভিযোগ তাহার দিদির উপর। দুই বৎসরের শিশুকে লইয়া দশ বৎসরের সীতা মাঝে মাঝে হাঁপাইয়া উঠে; কখনো বা মনে হয়, টুকুন না থাকিলে সে বাঁচিয়া যাইত। তৎক্ষণাৎ টুকুনের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সীতা মনে মনে বলে, ষাট্! টুকুনকে দুধ খাওয়াইয়া, কাজল পরাইয়া, মুখ খানি আঁচল দিয়া মুছিয়া সীতা তাহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়। সুশ্রী ছেলেটিকে দেখিয়া যে-কেহ কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দেয়, বলে, সুন্দর ছেলে! সীতা আনন্দে হাসিতে থাকে। কেহ কেহ বলে, ছেলেটা কি দেমাকে! ভারী কত! বেশ মোটা-সোটা ছেলে! সীতা তৎক্ষণাৎ তাহার কোল হইতে টুকুনকে ছিনাইয়া লইয়া বলে, দাও, আমার ছেলে দাও। ভারী লাগে তো কোলে নিতে এসেছিলে কেন মরতে? তারপর টুকুনের মাথায় ফুঁ দিতে দিতে সে বলে, মা ষষ্ঠি রক্ষে করো—ষাট্—ষাট্!

এই টুকুন, আর এই সীতা। মা'র সহিত তাহাদের বিশেষ কোন যোগ নাই। রুগ্না মাতার জন্য ঝি'র ব্যবস্থা আছে। পিতার সহিত তাহাদের যোগও যৎসামান্য। অধ্যাপক মহাশয় সকাল-সন্ধ্যা পাঠগৃহে পুস্তকপরিবেষ্টিত থাকেন। মধ্যে একবার অধ্যাপনা করিবার জন্য কলেজে যান। রাত্রিতে রুগ্না স্ত্রীর একবার তদারক করিয়া যখন সীতা ও টুকুনকে দেখিতে আসেন, তখন সীতা আপনি খাইয়াছে এবং টুকুনকে খাওয়াইয়া বুকের কাছে লইয়া ঘুমাইয়া গিয়াছে। একবার স্নেহের দৃষ্টি বুলাইয়া তিনি কন্যার অকাল-মাতৃত্ব নিরীক্ষণ করেন, তারপর ধীরে ধীরে শয়ন করেন। রাত্রে কোন কোন দিন টুকুন কাঁদিয়া উঠিলে সীতা বাবাকে জাগায় না, নিজেই টুকুনকে শান্ত করে বাহিরের বারান্দায়—আয় চাঁদ—ছড়ার সুরে গান গাহিয়া। অধ্যাপক মহাশয় জাগিয়া দেখেন স্তব্ধ নৈশপ্রকৃতির বুকে মাতৃত্বের কোমল জাগরণ। বুকের গভীর নিঃশ্বাস চাপিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শয়ন করেন।

সীতার জন্য তাঁহার দুঃখ সীমাতীত, কিন্তু উপায় কি। ঐ টুকুনকে কে মানুষ করিবে? দশ বৎসরের সীতা সঙ্গীহীনা, একাকিনা। তাহার খেলাঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পুতুলগুলি সবই টুকুনের হাতে বিপর্য্যস্ত, জামাকাপড় পর্যন্ত টুকুনের দৌরাত্ম্যে ধূলি-ম্লান। অথচ টুকুন আসিবার পূর্বে ঐ সীতাই ছিল তাঁহার একমাত্র নয়নানন্দময়ী আদরিণী কন্যা। ঐ সীতাই কতবার বলিয়াছে, বাবা, আমার যদি একটি ভাই থাকতো। কিন্তু ভাই আসিয়া তাহার সব সৌভাগ্য কাড়িয়া লইল। হাঁ, সীতাকে তো তিনি আর তেমন ঘরে দিতে পারিবেন না; ঐ টুকুন আসিয়া ভাগ বসাইয়াছে। এমন কি, ভাল করিয়া শিক্ষাদান করিয়া কন্যাকে যে ভাল বরের যোগ্য করিয়া তুলিবেন, তাহারও পথ বন্ধ করিয়াছে ঐ টুকুনই। অধ্যাপক মহাশয় ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখেন। 'নারী-জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত মাতৃত্ব' সম্বন্ধে একটা ভাল প্রবন্ধ লিখিবেন। উপাদন তাঁহার ঘরেই জমা হইতেছে।

ত্রয়োদশী সীতার কোলে পঞ্চমবর্ষীয় টুকুন। টুকুনের দৌরাত্ম্য দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে, আর কিশোরী সীতার মনে জাগিতেছে, কোন দূরাগত কামনার সঙ্কেত, না-শোনা বাঁশীর রেশ! অধ্যাপক মহাশয় আজিও তাঁহার প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। সীতার দিকে মন দিবার তাঁহার সময়াভাব, টুকুন সীতার আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। পত্নীর কথা প্রভাত এবং রাত্রি ছাড়া তাঁহার স্মরণ হয় না। সংসার চলিতেছে আপনার আবর্ত্তে! আকস্মাৎ একদিন সীতা আসিয়া বলিল—বাবা, টুকুনের হাতে খড়ি দিতে হবে। পাঁচ বছরে পড়ল যে!

বাবা চাহিয়া দেখিলেন, দিদির আঁচল ধরিয়া পঞ্চমবর্ষীয় টুকুন আবদার জুড়িয়াছে—খয়ি নেবো·····।

দর্শনচিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিয়া গেল; সীতা কিশোরী হইয়া উঠিয়াছে, অথচ লেখাপড়া প্রায় কিছুই শিখে নাই। উহাকে পাত্রস্থা করিবেন কিরূপে! কিন্তু সে-চিন্তা তাহার মনে রাখিবার অবসর সীতা দিল না। টুকুনের বিদ্যারম্ভের দিন স্থির করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ পঞ্জিকা লইয়া আসিল। অধ্যাপক মহাশয় দিন স্থির করিয়া তখনকার মত কন্যাকে বিদায় করিলেন, কিন্তু চিন্তাটা কাঁটার মত তাঁহার মনে বিঁধিয়া রহিল। টুকুন সীতার সব সৌভাগ্য অপহরণই করিয়াছে। সীতা কিন্তু তাহার জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নয়, হয়তো এখনো সে উপলব্ধিই করিতে পারে নাই, টুকুনকে মানুষ করিতে গিয়া সে নিজেকে কতদিক্ দিয়া বঞ্চিত করিয়াছে। তবুও টুকুন ছেলে, আর সীতা মেয়ে। বাঙ্‌লা দেশের সনাতনী মন অধ্যাপকের মধ্যে চাড়া দিয়ে উঠিল; টুকুনের সহিত সীতার তুলনা হয় না। সীতার বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই, কিন্তু টুকুনের বিদ্যালাভ হওয়া চাই-ই। এতবড় অধ্যাপকের পুত্রকে তাহার পিতার সম্মান রাখিতে হইবে। তাহাকে মূর্খ করিয়া রাখা চলে না।

অধ্যাপক বিদ্যারম্ভের আয়োজন করিলেন ভাল ভাবেই। সীতার আনন্দই ইহাতে সর্বাধিক। সে কি ভাবে টুকুনকে সাজাইবে, কোথায় বসাইবে, কেমন করিয়া টুকুন তাহার রাঙারাঙা কচি হাতে খড়ি দিয়া

অ-আ ক-খ লিখিবে, সীতা শুধু তাহাই ভাবিয়া সারা হইয়া উঠিল। প্রতিবেশীরা বলিতে লাগিল, নিজে সীতা লেখাপড়া শিখিতে পায় নাই, তাই ভাই-এর জন্য ভাবিয়া সারা।—ভাই তোর নিশ্চয় লেখাপড়া শিখবে সীতা, তুই কিছু ভাবিস না টুকুন নিশ্চয় লেখাপড়া শিখবে, সীতারও ইহা জানা আছে। বাবার মত পণ্ডিত হইবে টুকুন।

বিদ্যারম্ভ উৎসব শেষ হইয়া গেল। রাত্রে কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহারা বাহিরে ঘরে বসিয়া অধ্যাপকের সহিত আলাপ করিতেছেন। সীতার বিবাহ দিতে হইবে, অথচ লেখাপড়া তাহাকে কিছুই শেখান হইল না। বন্ধুরা বলিতেছেন, নিতান্ত কচি মেয়ে, এখানো শিখিবার যথেষ্ট সময় আছে, দিন না স্কুলে ভর্ত্তি করে।

কিন্তু অধ্যাপক জানেন, তাহা হইলে টুকুন কাঁদিয়া তাঁহাকে গৃহ ছাড়া করিবে। দিদির অত্যাধিক আদরে টুকুন বড়ই বেয়াড়া হইয়া উঠিয়াছে। ঐ যে, ঐ তো সে কাঁদিতেছে; সীতা কোথায় গেল। সীতা ও-বাড়ী হইতে ছুটিয়া আসিল। আজ উৎসবের দিনে সে একবার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য গিয়াছিল বন্ধু রাণীকে ডাকিয়া আনিতে। টুকুন ইতিমধ্যেই কিল চড় মারিয়া, জল ঘাটিয়া, কাদা মাখিয়া একাকার করিয়াছে। সীতা আসিয়া তাহাকে সামলাইতে পারে না।

—অত আদর দিস নে সীতা, শেষটায় কেউ-ই ওকে সামলাতে পারবে না,—বলিয়া অধ্যাপক মহাশয় সীতাকে সাবধান করিলেন। সীতারও বড়ই বিরক্ত বোধ হইতেছে। রাণীর সহিত দু'একটি কথা, কৈশোর-জীবনের কথা বয়ঃ-সন্ধির আবেগময়ী উচ্ছ্বাস কত-কির জন্যই সে রাণীকে আজ ডাকিয়া আনিল, কিন্তু টুকুন যেন আজ বেশী বাড়াবাড়ি করিতেছে। রাগিয়া সীতা তাহাকে ধমক দিল। রাণী বলিল, আঃ মর! ছেলেকে যত আদর করা হচ্ছে তত তার কান্না বাড়ছে। টুকুন আরো জোরে কাঁদিয়া উঠিল। সীতার কি যেন হইল, দিল টুকুনের গালে এক চড় বসাইয়া।

টুকুন চিলের মত চেঁচাইয়া উঠিল। দম যেন তাহার আটকাইয়া যাইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই টুকুন দিদির কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। তখনো টুকুন ফুলিতেছে।

সকালে টুকুনকে কোলে লইতে গিয়াই সীতার বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল। টুকুনের গা এত গরম কেন! কাল সীতা তাহাকে মারিয়াছে, তাহারই জন্য কি টুকুনের জ্বর হইয়াছে! সীতা বাবাকে ডাকিয়া আনিল। অধ্যাপক বলিলেন—ও কিছু না, কাল একটু অনিয়ম হয়েছে, জল ঘেটেছে, তাই বোধ হয় সর্দ্দি লেগেছে। কিন্তু সীতা কাঁদিয়া অস্থির করিয়া তুলিল, ডাক্তার ডাকো বাবা! অধ্যাপক কন্যার অধীরতায় তাহার মাতৃমূর্ত্তিরই বিকাশ দেখিলেন, ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

তৃতীয়দিনে টুকুনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল এবং ডাক্তার আসিয়া যাহা ব্যবস্থা দিলেন তাহা দেখিয়া অধ্যাপক বুঝিলেন, সীতার কথা শুনিলেই ভাল হইত। ডাক্তার ডাকিতে দেরী হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চম দিনে পঞ্চমবর্ষীয় টুকুন চলিয়া গেল এক অজানা দেশে। রুগ্না মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ঝি-চাকর সব চোখের জলে বন্যা বহাইয়া দিল, নির্লিপ্ত অধ্যাপকের পর্য্যন্ত চোখ দু'টি শুষ্ক রহিল না, কিন্তু সীতা নিশ্চল—মৃত টুকুনের মাথা কোলে লইয়া সীতা নির্বিকার বসিয়া রহিল। পাড়ার একটি সৎসাহসী যুবক সীতার কোল হইতে টুকুনের দেহ লইয়া সৎকার করিয়া আসিল, সীতা তথাপি বসিয়া রহিল। শেষে অধ্যাপক স্বয়ং আসিয়া পড়িলেন, সীতা, ওঠ মা, অমন করে বসে থাকলে টুকুন তো ফিরবে না।

অকস্মাৎ সীতা গগণভেদী চীৎকার করিয়া উঠিল।

—আর কখখনো মারবো না তোকে, ভাইয়ের টুকুন, ফিরে আয়!—

বিষাদের বাষ্পে পাড়াটা যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সীতা টুকুনকে লইয়া যে-খাটখানায়, শুইত, তাহাতেই আজিও শুইয়া রহিল। ক্রন্দনের আবেগে দেহ তাহার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পার্শ্ববর্তী গৃহে

অধ্যাপক মহাশয় নীরবে বসিয়া ভাবিতেছেন, সীতাকেই এবার তিনি মানুষ করিয়া তুলিবেন। কালই তাহার জন্য একজন মাষ্টার রাখিতে হইবে। পড়া শুনার মধ্যে সে হয়তো টুকুনের শোক কিছুটা ভুলিতে পারিবে।

সহসা সীতা উঠিয়া বসিল, বাবা জানো, তোমার ছেলেকে আমি মেরে ফেলেছি বাবা!

অধ্যাপক শিহরিয়া উঠিলেন, সে কি কথা মা!

—হ্যাঁ বাবা, রাণীর বিয়ে হবে, তার গল্প শুনবার জন্যে, আমি টুকুনকে মেরেছিলাম; খুব জোরে মেরেছিলাম বাবা, এত জোরে আর কখনো তাকে মারি নি!

অধ্যাপক বিষাদের স্বরে বলিলেন, তাতে কি টুকুন মরে মা! ও আমাদের ভাগ্যে মরেছে, কাঁদিস নে।

সীতা পুনরায় শুইয়া পড়িল। কয়েক মিনিট পরে উঠিয়া বলিল, —বাবা আমার ফাঁসি হওয়া উচিত।

—ছিঃ মা, ও-কথা ভাবতে নেই। তুইই টুকুনকে এত বড় করেছিলি তুই কি তাকে মারতে পারিস! আমার অদৃষ্টে ছেলে নেই—না থাক, তোকেই আমি সব বিদ্যে দান করে যাবো!

পরদিনই সীতার মাষ্টার বহাল হইয়া গেল। সকাল সন্ধ্যা দুইবার সীতাকে পড়িতে বসিতে হয়। বর্ষার আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসে,—ফার্ষ্টবুকের ব্যাঙের পাতা উল্টাইয়া সীতা বলিয়া উঠে বড্ড ঠাণ্ডা বাতাস, টুকুনের যদি অসুখ করে! মাষ্টার তাহার ভ্রম সংশোধন করিতে গিয়া দেখেন সীতা নিজেই ভুল বুঝিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে জানালার পথে—সীতা চেঁচাইয়া উঠে, এই ঝি, টুকনটা কোথায় গেল!

সীতা জানালা বন্ধ করিতে উঠিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়। তথাপি পড়িতে হয়। ক্ষণে ক্ষণে সীতার অমনোযোগ, আর মাষ্টার মহাশয়ের ধমক কোনোটাই কমিতেছে না। শেষে একদিন মাষ্টার মহাশয় অধ্যাপকের নিকট গিয়া সব কথা নিবেদন করিলেন।

আহারের সময় অধ্যাপক কন্যাকে কহিলেন, তুই পড়াশুনায় কিছু মনোযোগ দিস নে সীতা, কাঁদলে কি টুকুন ফিরে আসবে। আমার নাম তোকেই রাখতে হবে, বুঝেছিস।

সীতা নীরবে বাবাকে হাত ধুইবার জল ঢালিয়া দিল। আরো মাস-খানেক পরে অধ্যাপক কন্যার পাঠে অমনোযোগের পুনরভিযোগ শুনিয়া মৃদু তিরস্কারের সহিত বলিলেন, ও-রকম করলে চলবে না সীতা, পড়াশুনা কর।

সীতা মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, লেখাপড়া আমার হবে না বাবা, তার চেয়ে বিয়ে দিয়ে দাও, ঘর-সংসার করি।

চতুর্দ্দশী কন্যার কথায় চিরগম্ভীর অধ্যাপক বিস্ময়াহত হইয়া উঠিলেন। আধুনিক যুগের আশ্চর্য্য প্রগতিবাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও, বর্তমান কালের নারীদের সম্বন্ধে তিনি অনেক কথাই শুনিয়াছেন। তাঁহার কন্যা, মাত্র চৌদ্দ বৎসর যাহার বয়স, সে বিবাহ করতে চায়, এবং সেই 'ইচ্ছা' পিতাকে জানাইতে লজ্জা বোধ করে না।

অধ্যাপক নীরবে গিয়া শয়ন করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন: মানব-জীবনের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকায় অধ্যাপক বুঝিতে পারিলেন না যে, দশ বৎসর বয়সে যাহার মাতৃত্বের জাগরণ হইয়াছে, চতুর্দ্দশ বৎসরে সে বিকশিত হইতে চায়। সীতা লজ্জিত না হইলেও সীতার কথায় তিনিই লজ্জিত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু পড়াশুনা যখন তাহার হইবে না, আর বিবাহ যখন সে নিজেই করিতে চায়, তখন আপত্তি করিবার কি-ই বা কারণ থাকিতে পারে। বরং একটি ভাল ছেলে দেখিয়া জামাতা রূপে ঘরে আনিলে অধ্যাপকের কাজের কতকটা লাঘব হইবে।

দুই তিন মাসের মধ্যে তিনি সীতার বিবাহ দিলেন তাঁহারই একটি প্রতিভাবান সচ্চরিত্র ছাত্রের সঙ্গে। জামাতা ঘরেই রহিলেন।

অধ্যাপক যেন নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছেন। সীতার খবর তিনি কোন

দিনই লইতেন না, আজও লইবার অবকাশ পান না। বরং সীতাই এখন তাঁহার খবর বেশী করিয়া লইতেছে। রুগ্না পত্নীকে দুইবেলা দেখিয়া আসা ছাড়া অধ্যাপকের সহিত সংসারের আর কোন সম্বন্ধ নাই। বেশ আছেন তিনি। ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি এখনো গার্হস্থ্যাশ্রমে বাস করিতেছেন।

সহসা এক সন্ধ্যায় ঝি আসিয়া জানাইল, সীতা আসন্না-প্রসবা। জামাইবাবু নার্স আনিতে গিয়াছেন, কিন্তু সীতা বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে। বিস্মিত অধ্যাপক পঞ্চদশী কন্যার কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সেই শীর্ণা বিবর্ণা সীতা, তাহার খোকা হইবে। ত্বরিতে উঠিয়া তিনি ভিতরে আসিলেন। নার্স আসিয়াছে। অসহ্য যন্ত্রণার ভিতর দিয়া সীতার প্রসবকার্য্য শেষ হইল, কিন্তু সীতা বোধ হয় আর কথা বলিবে না।

শব্দহীন রাত্রির কোলে দাঁড়াইয়া অধ্যাপক দেখিতে লাগিলেন, মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া সীতা যেন চোখ খুলিল, বলিল, 'কি হয়েছে? মেয়ে?'

—না, ছেলে—হাসিমুখে নার্স তাকে জানাইল।

সতী ডাকিল—বাবা! অধ্যাপক কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

—আমি তোমার ছেলেকে মেরে ফেলেছিলাম বাবা, আমার ছেলেকে তোমায় দিলুম, ওকে তোমার সব বিদ্যে দিও।

বেদনার জমাট অশ্রুর মধ্যে অধ্যাপক অনুভব করিলেন, নির্লজ্জা সীতা কেন চাহিয়াছিল ঘর-সংসার করিতে।

—

চোদ্দ বছর পরে

আমার বাবাকে আপনারা নিশ্চয়ই চিনবেন—নাম করলে তো চিনবেনই। তিনি বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেন আর অধ্যাপনা করেন। বাবার আয় এমন কিছু বেশি নয়—কিন্তু সংসারে আমরা লোক মাত্র তিনটি; মা বাবা আর আমি—তাঁদের আমি একমাত্র মেয়ে। আমার বয়স এই চোদ্দ মাত্র, কাজেই আমার বিয়ে দেবার চিন্তার বোঝা বাবার মাথায় এখনো তেমন চাপেনি, তাই স্বচ্ছলেই চলে যায় আমাদের। মা আবার একটুখানি বেশি গোছালো মেয়ে; না, ঠিক কৃপণ নয়—তবে খুব হিসেবি।

বাবার আমার সব ভালো, আমাকে তো ভালোবাসেনই—মাকেও খুব ভালোবাসেন। আপনারা হাসছেন? হাসবার কিছু নেই; আমার বাবার বয়স মাত্র চৌত্রিশ, আর মা'র বত্রিশ; আমি মা'র আঠারো বছর বয়সের সন্তান। বাবার চেহারা তেমন কিছু নয়, রং কালো—তবে গড়ন নেহাৎ মন্দ নয়। কিন্তু মা আমার খুবই সুন্দর। ভাগ্যি যে আমিও খানিকটা মা'র মত হয়েছি—কিন্তু আমার গায়ের রং বাবারই কাছে ঘেসে যায়।

হলে কি হবে—আমি এমন আদুরে আর আবদেরে হয়ে উঠেছি যে মা আমাকে সামলাতেই পারেন না, বাবাও অনেক সময় পারেন না। বাবার বইপত্তর অবশ্য আমি যথাসাধ্য গুছিয়ে-গাছিয়ে দিই—কলমে কালি আছে কিনা দেখি—লেখা কাগজগুলো ছুঁচসুতো দিয়ে গেঁথে রাখি—চিঠিপত্তর ফাইল করি—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ওছাড়া আমি কুটোটি কেটে দুটোটি করি না—মা'র সাধ্যি কি যে আমায় কিছু বলেন। অবশ্যি আমি স্কুলেও পড়ি।

বাবা ক'দিন থেকে খুব-কি-কতকগুলো বই পড়ছেন। নানা রকমের বই—কিন্তু খুব পুরনো পুরনো—ছোট বড়, মাঝারি।

বইগুলোতে অনেক ছবিও আছে। ভিখারী, খেতে-না-পাওয়া মানুষের মিছিল, আধমরাকে কুকুরে খাওয়া, পথের ধারে পড়ে থাকা জঞ্জাল থেকে খাবার খুঁটে খাওয়া, গরুতে-মানুষে-কুকুরে এক জায়গায় খাওয়া, ছেলের হাত থেকে বড়ো মানুষের খাবার কেড়ে খাওয়া—এইরকম বিস্তর আজগুবি ছবি আছে কয়েকখানা বইয়ে। এর মধ্যে একখানা ছবি আমার বড্ড ভালো লাগলো। ছবিটার বর্ণনা করবার মত ভাষা আমি আজও শিখি নি—তবে যেমন তেমন করে বললেই আপনারা বুঝে নেবেন ;—'কলকাতার ফুটপাথে একটা মেয়ে মরে পড়ে আছে—চোখ দুটো খোলা, মুখটা হাঁ হয়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে ; মরে গেছে অনেকক্ষণ—কিন্তু তার খোলা বুকে পড়ে একটা বছর দেড়েকের খোকা—মাই টানছে, টুকটুক্ করে তাকাচ্ছে মা'র মুখপানে।'

কে জানে, কেন এই ছবিটা আমার এত ভালো লাগলো। বারবার দেখছিলাম, মনে হচ্ছিল—এই মা যেন চিরন্তনী মা—মরে গিয়েও ছেলের জন্য বুকে ওর দুধ রেখে যায়! চোখে জল এসে গিয়েছিল—বাবা হঠাৎ এসে পড়লেন।

—এই কী দেখছিস ?

—ছবি। বললাম বাবাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম—এগুলো কিসের ছবি বাবা ?

—ওসব মহামন্বন্তরের ছবি রে মা—ওর মানে তুই এখন বুঝবি না।

—মহামন্বন্তর। কথাটা আমার কানে নতুন, ওর মানেও আমি জানি না, তাই অমন করে ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করলাম।

বাবা হেসে বললেন,—ও তুই বুঝবি না মা—আর বুঝতেও যেন না হয়। ওটা আমরা বুঝেছি ভালো ক'রে।

কিন্তু না বুঝে নিরস্ত হবার মত মেয়ে আমি নই। জেদ বেড়ে গেল আমার। বললাম,—বুঝিয়ে দাও তুমি বাবা—কেন আমি বুঝবো না ? তুমি বোঝালেই বুঝবো।

বাবা জানেন আমার গোঁ। বললেন,—বেশ দেবো বুঝিয়ে। বড়দিনের ছুটিতে তোকে দেশে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দেব।

বড়দিনে দেশে যেতে পাব ভেবে মনটা খুশি হয়ে উঠলো, তখনকার মত গোঁ ছেড়ে দিলাম। বাবা পড়তে বসলেন—আমি গেলাম খেলতে। দেশে যাব বড়দিনে, আর দিন-আট-দশ মাঝে মাত্র আছে। দেশে আমি কখনো যাই নি; কতবার যাব বলেছি —বাবা কিছুতে নিয়ে যান না, মাও যায় না। বাবা বছর দুই আগে একবার গিয়ে একদিন মাত্র থেকে চলে এসেছিলেন। আমার কিন্তু ভারি ইচ্ছে করে দেশে যেতে। ইচ্ছে করে—নদী, পুকুর, মাঠ, ঘাট দেখে বেড়াবো—পুণ্যিপুকুর ব্রত করবো—'বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল' বলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়ে সাথীকে ডাক দেব—কত কি ইচ্ছে করে! এবার যাব ঠিক।

বড়দিন এসে গেল। আমি তৈরী হয়েই ছিলাম। মা কিন্তু বারবার বাধা দিতে লাগলো—মনিকে এই শীতের দিনে দেশে নিয়ে গিয়ে ম্যালেরিয়া ধরাতে হবে না—মেয়ের শরীর খারাপ হয়ে যাবে, ইত্যাদি। আরো কত কি বাবাকে বললো মা—আমি বুঝতেই পারলাম না। শেষটায় আমার হয়তো যাওয়াই হবে না ভেবে কান্না পেয়ে গেল। বাবা চোখ মুছে দিয়ে বললেন—কাঁদিস নে—আমি নিয়ে যাব তোকে! মা আর কি করে—আমার কাপড় জামা দিল গুছিয়ে-গাছিয়ে। বলে দিল—তিন দিনের মধ্যে ফিরতে হবে, আর কাঁচা কুল, পাকা তেঁতুল যেন না খাই।

বেশ খাবো না—বলে রেলগাড়ীতে এসে উঠলাম।

পরদিন সকালেই দেশের মাটিতে। আঃ কি সুন্দর! চোখ আমার জুড়িয়ে যেতে লাগল। ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে তেপান্তর মাঠ, মাঝে মাঝে গাছ আর গরুর গাড়ি-চলা পথ। ঐ—ঐ দূরে আকাশ এসে মাটি ছুঁয়েছে, তখনো সূর্য উঠছে লাল হয়ে, বেশ তাকানো

যায় তার দিকে, দেখছি। অনেক দূরে এক ঝাঁক বক সার বেঁধে উড়ে চলেছে, তাদের পালকে রোদ লাগছে ; ঝিক্‌মিক্ করতে করতে মিলিয়ে গেলো মেঘের অড়ালে। সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘ—এদিকে পশ্চিমের আকাশ ঘন-নীল—খুশি মনে দেখছিলাম এই সব।

গরুর গাড়িতে বসে আছি, পথ প্রায় পাঁচ মাইল—তবে গ্রাম। ধানকাটা হয়ে ক্ষেতের মাঝে গাদা করে রেখেছে—গাড়িতে চড়াচ্ছে, সোনার মত শীষগুলো রোদ লেগে সোনার থেকে দামী হয়ে উঠছে। কী চমৎকার! বইয়ের পড়া সব কথাগুলো মিলে যাচ্ছে একেবারে। বাবাকে বললাম অভিমান করে'—এতো ভালো দেশ আমাদের, তুমি এতদিন কেন আমায় দেখাওনি বাবা ?

—দেশ যে ভালো—সেটা এর আগে তুই বুঝতে পারতিস না মনি ?

এই কথা বলে বাবা চুপ করলেন। বুঝতে পারতাম না কেন, কে জানে! না বোঝবার মত কিছু তো দেখছি না। কিন্তু বাবাকে কিছুই বললাম না - বাবা যেন খুব চিন্তিত মনে বসে। খানিক উস্‌খুস্ করে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবছো বাবা ?

—না, কিছু না তেমন। তারপর একটু থেমে বললেন আবার,—সে অনেক দিন হলো, তখন তুই জন্মাসনি, তেরোশো পঞ্চাশ সাল।

—কেন, তেরোশো পঞ্চাশেই তো জন্মেছি আমি!

—হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তোর মার পেটে জন্মের তারিখ—তুই মাটিতে জন্মেছিস্ তেরশ একান্নতে। সেই তেরশ পঞ্চাশের কথাই মনে পড়ছে।

—কেন বাবা! কি হয়েছিল তেরশ পঞ্চাশে ?

—মন্বন্তর—মহা-মন্তর! বলে বাবা খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন।

মন্বন্তর! কথাটা শুনেই বাবার বইগুলোর কথা মনে পড়ে গেল, বললাম,—ঐ বইগুলোতে সব লেখা আছে বাবা ?

—হ্যাঁ। ওগুলো শুধু কথা-সাহিত্য নয়—ওগুলো ইতিহাসও।

ওর থেকে আজকের বর্তমান মানুষ আর আগামী ভবিষ্যৎ মানুষ ইতিহাস লিখবে।

কিছুই বুঝলাম না, তাই চুপ করে রইলাম। বাবা সেটা বুঝতে পেরে হেসে বললেন,—শোন মনি, সেবার আমার বি-এ পরীক্ষা দেবার কথা। মা খেতে না পেয়ে মারা গেলেন, আমাকে কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত খাইয়েছিলেন। আমি বুঝতেই পারিনি যে তিনি উপোস দিয়ে আমাকেই খাওয়াচ্ছেন।

বুঝতেই পারনি? তুমি তো বাবা বড্ড বোকা।

হ্যাঁ বোকাই তো। কিন্তু সে বছর সবাই বোকা হয়ে গিয়েছিলরে মা—গরীবদের সবাই বোকা বনে গিয়েছিল। তারপর শোন। মা আমাকে কোনরকমে খাওয়াচ্ছিলেন, আর আমি নিশ্চিন্দি হয়ে কলেজে পড়ছিলাম। হঠাৎ একদিন কার বাড়ি থেকে একমুঠি চাল চেয়ে আঁচলের খুঁটে বেঁধে আনবার সময় হোঁচট খেয়ে মা পড়ে গেলেন। অনাহারে শরীর একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। মুখে চোখে শুধু জল দিলাম। একবার চাইলেন আমার মুখের দিকে মা।

বাবার মুখের দিকে চাইছিলাম না, দেখছিলাম গরুরগাড়ি বোঝাই ধানের স্তূপটা কেমন যাচ্ছে। বলে উঠলাম, মারা গেলেন ঠাকুমা? ঐ ছবিটা বুঝি তারই বাবা? সেই যে মা মরেও ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছেন?

—না না, ওটা অন্য এক অভাগীর, আমি সংগ্রহ করে রেখেছি। জগতের সব মা'কে ঐ একটা ছবিতেই এঁকে দিয়ে গেছে সেই হতভাগী মা। মাতৃত্বের ওর থেকে জ্বলন্ত ছবি আমি দেখিনি আর।

—এতক্ষণে চাইলাম বাবার মুখ পানে। তাঁর চোখে জল। বললাম—তোমার দেশে এত ধান হয় বাবা, তবু না খেয়ে মরলো কেন সব?

—সে আর এক ইতিহাস। বলে বাবা চুপ করলেন।

মনটা ভারী হয়ে উঠ্‌ছে দুজনেরই। হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন

—মা মারা যাবার পর দেখলাম, খালি বাড়িটাই আছে। ঘাট বাটা সবই বিক্রী করে দিয়ে মা আমায় খাইয়েছেন; তাই মা'র বুকের দু' টুক্‌রো হাড় নিয়ে বেরিয়ে পরলাম মা-গঙ্গার জলে দিতে। বাড়িতে আর ফিরলাম না; পথে পথে ঘুরতে লাগলাম, বগলে খানকতক বই।

—তারপর বাবা? রূপকথা শুনছি, এমনি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম।

—তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখি, একটা গাছের তলায় আধাবয়সী একটি মা মরছে, আর পাশে দাঁড়িয়ে সেই মা'র আঠারো বছরের মেয়ে।

কাঁদছিল? আমি প্রশ্ন করলাম বাবাকে।

—না, একটা গুণ্ডার সংগে কথা বলছিল। গুণ্ডাটা ওকে বলছিল, তার সংগে গেলে চার আনা পয়সা দেবে। মেয়েটা বলছিল, আগে একটু দুধ দিতে হবে।

—দিল না দুধ?

—না। দুধ পাবে কোথায়? মেয়েটা মার মাথা কোলে নিয়ে বসে পড়ল, আর সেই গুণ্ডাটা তাকে হাত ধরে টানতে আরম্ভ করলো। চীৎকার করে উঠলো মেয়েটা। আমি ছুটে গিয়ে তাকে অনেক কষ্টে রক্ষা করতে পেরেছিলাম। গুণ্ডাটা পালিয়ে গেল। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে মা'র মুখের দিকে চেয়ে দেখলো, এই ধাক্কাধাক্কিতে মা কখন মরে গেছে।

—আহা! তারপর?

—তারপর ওর মাকেও গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলাম। শুনলাম, ওদের অবস্থা আগে ভালোই ছিল। ভদ্রঘরের মেয়ে ওরা; গ্রামে খেতে না পেয়ে শহরের লঙ্গরখানায় আশ্রয় নিতে যাচ্ছিল, পথে মা'র এই অবস্থা।

—কেন বাবা, এতো ধান হয় তোমার দেশে—সে বছর হয়নি কিছুই?

—হয়েছিল মা, কিন্তু যারা ধান জন্মায়—ধান যে তাদের নয়।

—ও, বড় লোকেরা নিয়ে নেয় বুঝি। তুমি কি করলে বাবা সেই আঠারো বছরের মেয়েটিকে নিয়ে?

—কি আর করবো—কোথায় ফেলে দেব। আমার দুঃখের জীবনে সেও সংগী হলো।

—কোথায় আছে বাবা সে? বেঁচে আছে?

—হ্যাঁ। তবে ঐ ভাবে ঘুরে ঘুরে কিছুদিন জীবন কেটেছিল বলে দেশ আর তাকে নিল না। দেশে যেতে পারে না আর।

—কোথায় তাহলে থাকে?

বাবা চুপ করে রইলেন। আমি আবার বললাম—কোথায় আছে তাহলে সে?

—সে-ই তোর মা।

আজ বুঝতে পারলাম, মা আমার কেন দেশের উপর এত চটা—বলে—'জংলা দেশ'। কিন্তু এই জংলা দেশেই আমার বাবার মতন সোনার মানুষও তো জন্মায়।···

—

জন্মভূমি

বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে।

এখনও প্রায় দুই ক্রোশ পথ—কখন সে যাইবে। সুমুখে অন্ধকার রাত্রি, বহুদিন পল্লীগ্রাম ছাড়া সে, কেমন যেন গা-ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। এখনও সূর্য অস্ত যায় নাই, কিন্তু গরুর গাড়ীর সরু পথটির দুই পার্শ্বে বৃক্ষলতার পটমণ্ডপ যেন এখনি জানাইয়া দিতেছে, এ পথে রাত্রি কি ভীষণ আকার ধারণ করে। শঙ্কর যত দ্রুত সম্ভব হাঁটিতে লাগিল। কিন্তু মানুষ ত আর ছুটিয়া দুইক্রোশ পথ যাইতে পারে না, তাই মাইল খানেক যাইতে না যাইতেই নামিয়া আসিল অন্ধকার। দুই পাশের গাছ-পালাগুলি যেন বিশাল অরণ্যানীর মত বোধ হইতেছে। জোনাকী জ্বলিয়া ঐ অরণ্যের ভীষণতা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। শঙ্কর তথাপি হাঁটিতে লাগিল। যাইতেই হইবে তাহাকে, যেমন করিয়াই হউক, আজ তাহাকে পৌঁছিতেই হইবে রাণীগ্রাম। না হইলে রাস্তায় ত আর গ্রাম নাই, সে থাকিবে কোথায়!

বহুদিন শঙ্কর দেশছাড়া। পনের বৎসরের বালক শঙ্কর যাত্রা-দলের এক অধিকারীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। সে আজ বিশ বৎসর পূর্বের কথা। আপনার বলিতে কেহই তাহার ছিল না। 'বোধোদয়' শেষ হইবার পরই গ্রাম্য পাঠশালা ছাড়িয়া বখাটে হইয়া যাইতেছিল সে। পৈত্রিক ভিটায় সন্ধ্যাটা দিবারও তাহার সময় হইত না, বেলা থাকিতেই গানের আড্ডায় চলিয়া যাইত এবং সেখানে নেশা-ভাঙ্গ্‌ করিয়া দিন কাটাইত। রাত্রি গভীর হইলে সবাই বাড়ি ফিরিত আর শঙ্কর একাই বসিয়া বসিয়া নেশার ঝোঁকে বাঁয়া-তবলা বাজাইয়া আপন মনে গান করিত। কতদিন সমস্ত রাত্রিই গান করিয়া কাটাইয়াছে সে।

সেবার দোলের সময় শহর হইতে যাত্রাপার্টি আসিয়া গান করিল। শঙ্কর মুগ্ধ হইয়া গেল। অধিকারীর নিকট গিয়া আবেদন করিল, এই দলে যদি শঙ্করকে যে-কোন একটা পার্ট দিয়া রাখা হয়। অধিকারী মহাশয় তাহার চেহারা দেখিলেন, গলার স্বর শুনিলেন এবং জানিলেন যে, আপনার বলিতে তাহার কেহই নাই। এমন সুবিধার লোককে তিনি ছাড়িলেন না, শঙ্করকে লইয়া গেলেন। তদবধি শঙ্কর কলিকাতারই অধিবাসী। যাত্রাদল ছাড়িয়া সে থিয়েটারে ঢুকিয়াছে, কিছু যশ এবং অর্থও হয়ত পাইয়াছে কিন্তু বিনিময়ে যাহা ছাড়িতে হইয়াছে তাহা তার জন্মভূমি। সেই শঙ্কর আজ দীর্ঘ বিশ বৎসর পরে তাহার জন্মভূমিতে ফিরিতেছে। গ্রামের যাহারা তাহাকে বিশেষরূপে চিনিত, আজ হয় ত তাহারা চিনিতেই পারিবে না। যাহাদের সঙ্গে সে সারা রাত্রি তবলা বাজাইয়াছে, আজ হয় ত তাহারা সভ্য ও বড়লোক। কে জানে, কত কি পরিবর্তন হইয়াছে গ্রামের! তথাপি শঙ্করকে যাইতে হইবে।

অভ্যাস নাই বহুদিন এরূপ জঙ্গলাকীর্ণ পথে চলার। টর্চ একটা আনিলে খুবই ভালো হইত। কিন্তু এত কি আর মনে থাকে! শঙ্কর চলিতে লাগিল। কিছুতেই তাহার গতি আজ রুদ্ধ হইবে না। বহু আশা করিয়াই সে জন্মভূমি দর্শনে আসিয়াছে।

রাত্রি গভীর হইয়া উঠিয়াছে। দূর বনে শৃগালের প্রহর-ঘোষণার রব শুনিয়া শঙ্কর বুঝিল, গ্রামের হয়ত সকলেই এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তবে সে কাহার ঘরে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে! তাহাকে ত কেহ দিবাভাগেই চিনিবে না, এই রাত্রিকালে কে তাহাকে আশ্রয় দিবে। তাহার নিজের ভিটা কি আর বিশ বৎসর পরে বর্তমান আছে! অসম্ভব।

কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে ত আর থাকা যায় না; শঙ্কর গ্রামে প্রবেশ করিল।

কত কি পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। যেখানে বাড়ি ছিল সেখানে ভাঙা ভিটা, যেখানে মাঠ ছিল সেখানে বাড়ি। বাবুদের কাছারী-

বাড়িটা ভাঙিয়া গিয়াছে না কি ? না, এখানে ত কোন বাড়ি ছিল না, ছিল একটা পুকুর। তবে কি সেই পুকুরটা ভরাট করিয়া বাড়ি গাঁথা হইয়াছে! অন্ধকারে শঙ্কর কেমন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবে তাহার পরিচিত বাড়ি! দূর হউক, আজ না হয় ঐ হাটতলার চালাতেই শুইয়া কাটাইয়া দেওয়া যাক! কাঁহাতক আর ঘুরিয়া মরা যাইবে! শঙ্কর হাটতলার পুরাতন জীর্ণ টিনের ঘরটায় আসিয়া প্রবেশ করিল।

অত্যন্ত অপরিষ্কার। দুই তিনটা খেঁকি কুকুর শুইয়া রহিয়াছে। শঙ্কর ঢুকিবামাত্র ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; তাহারা তাহাদের বাসস্থানে অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছে। শঙ্কর সভয়ে দশহাত পিছাইয়া আসিল।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল কুড়ি বৎসর পূর্বের শঙ্করের কথা —যে এমনি কয়েকটা কুকুরের সঙ্গেই শুইয়া; তবলা বাজাইয়া রাত্রি কাটাইত। আজ সে কতখানি ভয় পাইয়াছে এই সামান্য জীব কয়টির একটু চীৎকারে! শঙ্কর মনে মনে হাসিল। হাততালি দিয়া কুকুরগুলোকে বলিল—চুপ! চুপ কর্। আমাকেও একটু জায়গা দে-বাবা—তোদেরই একজন আমি! কুকুরগুলা বুঝিল কি না কে জানে —শঙ্কর উহাদের একপাশেই শুইয়া পড়িল।

রাত্রি ভালই কাটিল। সকালে শঙ্কর বাহির হইল গ্রামবাসীদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে। সুদীর্ঘ বিশ বৎসরে গ্রামের সব কিছুই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; কত পতিত জমিতে নূতন বাড়ি উঠিয়াছে।

শঙ্কর একাই সমস্ত গ্রামটা একচক্রে ঘুরিয়া আসিতে বাহির হইল। —আশ্চর্য! কেহই তাহাকে চিনিল না। শঙ্কর কিন্তু অনেককেই চিনিতে পারিয়াছে—তবে কাহাকেও কিছু বলে নাই। পরিচয় দিলে হয়ত তাহারা চিনিতে পারিত—শঙ্কর তাহা চাহে না—সে চায় গ্রামের কেহ তাহাকে না চিনিলেই ভাল। সে শুধু গ্রামখানি একবার চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া যাইবে। হয়ত এই জীবনে আর আসা হইয়া

উঠিবে না। একটা দিন মাত্র কাহারও আতিথ্য গ্রহণ করিয়া গ্রামটি দেখিয়া চলিয়া যাইবে।

শঙ্কর আশ্চর্য হইতেছিল। যাহারা তাহার সহিত দুপুর রাত্রি পর্যন্ত হল্লা করিত, হাজার রকমের দুষ্ট বুদ্ধি বাহির করিয়া গ্রামবাসীদের জ্বালাইয়া ছাড়িত, তাহারা আজ শঙ্করকে চিনিল না পর্যন্ত। কি এত পরিবর্তন হইয়াছে শঙ্করের। হ্যাঁ, সে একটু মোটা হইয়া গিয়াছে, আর দাড়িগোঁফ রাখিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি একেবারে চেনাই যায় না।

অবশ্য বয়সও হইয়াছে এবং একাদিক্রমে বিশ বৎসর তাহাকে কেহই দেখে নাই।

শঙ্কর ভাবিল যে, পরিচয় দিলে নিশ্চয় উহারা চিনিতে পারিবে, কিন্তু কি-ই বা প্রয়োজন। আর কতক্ষণের জন্যই বা। শঙ্কর তো আর এখানে বাস করিতে আসে নাই—একটা দিনের জন্য জন্মভূমি দেখিতে আসিয়াছে। না—শঙ্কর কাহাকেও পরিচয় দিবে না।

গ্রামের সব লোকই কিন্তু শঙ্করের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেছে। দু'চার জন বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি প্রশ্নও করিল—'কোথা থেকে আসা হ'চ্ছে মহাশয়ের?' শঙ্করের হাসি পাইল, ইহারাই তাহাকে কত তিরস্কার করিয়াছেন 'বকাটে ছেলে' বলিয়া, আর আজ কিনা 'মহাশয়' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। তবুও শঙ্কর পরিচয় দিল না—বলিল, কলিকাতা হইতে সে পায়ে হাঁটিয়া বাংলা দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। প্রত্যেক বড় গ্রামের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্যগুলি সে দেখিয়া যাইবে এবং এই বিষয়ে কাগজে প্রবন্ধ লিখিবে। শুনিয়াই গ্রামবাসীরা তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল। শঙ্করকে লইয়া সমস্ত গ্রাম ঘুরিল এবং তাহাদের একজনের গৃহে শঙ্করের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করিল।

কয়েকটি যুবক আসিয়া তাহার সঙ্গ লইল এবং বলিল—'চলুন, আমাদের গ্রামের প্রাচীন জিনিস আপনাকে আমরা দেখাচ্ছি।' তাহারা চলিল শঙ্করের সঙ্গে। বুড়াশিবতলা, ধর্মরাজের বটগাছ,

পাষাণকালীর মন্দির,—সবই তাহারা দেখাইল শঙ্করকে এবং প্রত্যেকটির সম্বন্ধে গ্রামের প্রচলিত ইতিকথাও শুনাইয়া গেল। শঙ্কর গভীর শ্রদ্ধার সহিত শুনিল তাহার বহুবার শ্রুত সেই ইতিহাস। তাহার মনে হইতে লাগিল—সে যেন পুনরায় শিশু হইয়া গিয়াছে, আর সকলেই তাহার অদম্য কৌতুহল নিবারণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। দ্বিপ্রহর বেলা পর্যন্ত তাহারা শঙ্করকে লইয়া ঘুরিল।

বেশ লাগিতেছে শঙ্করের। এই চির-পরিচিত গ্রামে সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়া গিয়াছে সে আজ—আর এতগুলি শ্রদ্ধাভাজন হৃদয় তাহাকে ঘিরিয়া গ্রামের গৌরব-দীপ্ত ইতিহাস বলিয়া যাইতেছে। যদি তাহারা জানিতে পারে যে, তাদের অদ্যকার মাননীয় অতিথি এই গ্রামেরই একজন হতভাগ্য বাসিন্দা, তবে তাহাদের শ্রদ্ধা কেমন করিয়া উবিয়া যায় তাহা দেখিবার বস্তু হইয়া উঠিবে। অল্প পরিচয়ের আড়ালে মানুষ মানুষকে কেমন বিস্ময়ের চোখে দেখে, ইহা হয়ত তাহারই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কিন্তু শঙ্করের কোথায় যেন বেদনা বোধ হইতেছে। তাহার জন্মভূমিতে সে আজ কেহ নয়, নিতান্ত একটা অপরিচিত। সে চলিয়া গেলে ইহারা ভাবিবে, একজন মহানুভব পরিব্রাজক তাহাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন—ইহার বেশী তাহারা আর কিছুই জানিবে না—শঙ্করের সহিত তাহাদের নাড়ীর যোগ কোথায় তাহা ইহারা বুঝিবে না। শঙ্কর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

যুবকগুলির উৎসাহের অন্ত নাই। গ্রামের সব কিছুই তাহারা দেখাইবে উহাকে। অপরাহ্নে শঙ্করকে টানিয়া লইয়া চলিল তাহারা তাহাদের নব প্রতিষ্ঠিত 'সৎকর্মমন্দির' দেখাইবার জন্য। শঙ্কর চলিল। যেখানটায় শঙ্করের বাল্যকালে ছিল একটা গাঁজা ও চরস খাইবার আড্ডা, সেই পুরাতন দুর্গা-দালানটিই মেরামত করাইয়া সৎকর্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে আজ ক্লাব, লাইব্রেরী, কত কি? কয়েকটি যুবক ইহারই মধ্যে শঙ্করকে অভিনন্দন দিবার আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছে। রক্তকরবী ফুলের

মালাটি রাখা হইয়াছে টেবিলের উপর। সভায় গ্রামের জমিদার পৌরোহিত্য করিবেন—তিনিও আসিয়াছেন। সমস্তই ঠিক।

ধীরে ধীরে শঙ্কর আসিয়া ঢুকিল সৎকর্মমন্দিরে। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার বাল্যস্মৃতির লেশমাত্রও অবশিষ্ট নাই। ভালই হইয়াছে, গাঁজার আড্ডায় একটি সৎকর্মের অনুষ্ঠান হইতেছে—খুবই ভাল। তথাপি শঙ্কর যেন খুশি হইতে পারিল না। তাহার যেন মনে হইল—এই মন্দিরের সহিত তাহার রক্তের কোন সম্পর্ক নাই—শঙ্কর নিরবে দাঁড়াইল সভার মধ্যে। চারিদিকে লোক গিস্ গিস্ করিতেছে। সভাপতি মহাশয় প্রথমেই দাঁড়াইয়া গ্রামবাসীদের সহিত শঙ্করেব পরিচয় করাইয়া দিলেন—বলিলেন, 'ভ্রাতৃগণ, আজ যে মহান অতিথি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁর মহৎ দৃষ্টান্ত দেখে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে বাংলাকে ভালবাসা কাকে বলে। এই ত্যাগবীর বাংলা-মা'র এই সুযোগ্যে সন্তান ট্রেণ-ষ্টিমার-মোটরের যুগেও পায়ে হেঁটে পল্লীগ্রাম দেখতে বেরিয়েছিলেন কলকাতা থেকে। দেখুন এঁর পল্লীপ্রীতি। কতখানি এর নিষ্ঠা বাংলা মা'র সেবায়। আপনারা জানেন যে পল্লীকে না চিনলে বাংলাদেশকে চেনা যায় না ইনি তাই অসীম কষ্ট সহ্য করেও বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করছেন, প্রত্যেক গ্রামের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ স্বচক্ষে দেখছেন—হৃদয় দিয়ে অনুভব করছেন। আমরা আজ এই মহান পুরুষকে, বাংলা-মা'র এই একনিষ্ঠ সেবককে আমাদের মধ্যে পেয়ে ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি। প্রার্থনা করি ঈশ্বর এঁকে অটুট স্বাস্থ্য, অসীম শক্তি, অপ্রমেয় পরমায়ু দান করুন। বাংলা, মা'র সেবায় আত্মনিয়োগ করে এই ধর্মবীর যেন বঙ্গভূমির আর তাঁর বাঙালী ভাইয়ের মুখ উজ্জ্বল করতে পারেন।

আমরা এবার তাঁর মুখ থেকে বাংলার পল্লী-সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই, যাতে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে দেশসেবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠতে পারে।'

করতালিধ্বনিতে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ছোট একটি

ফুটফুটে মেয়ে আসিয়া শঙ্করের গলায় পরাইয়া দিল রক্তকরবীমাল্য—কপালে দিল চন্দনপঙ্ক। জয়ধ্বনির মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল শঙ্কর বক্তৃতা করিতে।

শঙ্কর আরম্ভ করিল—খবরের কাগজে দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা যাহা সে পাঠ করিয়াছে তাহাই নিজ অভিজ্ঞতার কথা হিসাবে বলিয়া গেল। বলিল, প্রত্যেক গ্রামে যদি এমন সৎকর্মানুষ্ঠান হয়, এমনি উৎসাহ-প্রবণ যুবকদল গঠিত হয়, তবে দেশের দুর্দিন ঘুচিতে দেরী হইবে না। সর্বশেষে শঙ্কর বলিল যে, বিশেষভাবে এই গ্রামের কথা ও এই সৎকর্মমন্দিরের কথা কলিকাতায় গিয়া সে কাগজে লিখিবে।

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হইল।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শঙ্করের মনে হইল—এখনও যে-মাটিটুকুতে সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তাহা দেখা হয় নাই। কিন্তু ইহাদের কাছে সে-কথা বলা চলে না। ভাবিল, ভোরের দিকে জ্যোৎস্না আছে—সেই সময় উঠিয়া একবার গিয়া দেখিয়া লইবে তাহার জন্মস্থানটুকু—তারপর প্রভাতে আবার যাত্রা করিবে—যেখানকার সেইখানে।

আজ আর শঙ্করকে হাটতলায় টিনের চালায় যাইতে হইল না। মন্দিরের প্রেসিডেন্ট জমিদার চন্দ্রবাবুর বৈঠকখানাতেই তাহার স্থান হইল। গভীর রাত্রি পর্যন্ত গ্রামের যুবকবৃন্দ তাহার চারিপার্শ্বে বসিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিল।

শঙ্করের শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ইহারা উঠিলে সে একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইবে। একবার উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া বলিবে—জননি, জন্মভূমি আমার!....

রাত্রি দ্বিপ্রহর নাগাদ সকলে চলিয়া গেল। শয্যায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল কত কথা। করবী ফুলের মালাটা তখনও বুকের উপর দুলিতেছে। ঐ বিজয়মাল্যই আজ তাহার ও গ্রামের মধ্যে তুলিয়া দিল একটা বিরাট প্রাচীর। না, ও প্রাচীর সে ভাঙিয়া ফেলিবে সকালে উঠিয়াই সে সকলকে ডাকিয়া বলিবে,—সে কোন মহাব্রতী

দেশকর্মী নয়—কোনরূপ দেশসেবার কাজ জীবনে সে করে নাই—সে তাহাদের মত, তাহাদেরই একান্ত আপনার—যাহাকে তাহারা একদিন ঘৃণা করিয়াছে, লাঞ্ছনা দিয়াছে, সে সেই শঙ্কর।

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কল-কোলাহলে ঘুম ভাঙিয়া গেল। শুনিল ছেলেরা গাহিতেছে 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং' শঙ্কর উঠিয়া বাহিরে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—'বন্দেমাতরম্'।

শঙ্কর রাত্রির সংকল্পের কথা ভুলিয়া গেল,—না—বলিতে পারিল না যে, তাহাদের শঙ্কর—তাহাদেরই মত নিতান্ত দীনহীন—নিতান্ত স্বার্থপর, পরানুগৃহীত শঙ্কর সে। ধীরে ধীরে আসিয়া সে যোগ দিল সংগীতে। অল্পক্ষণ মধ্যে বহুলোক আসিয়া জুটিল। শঙ্করকে, ত্যাগব্রতী দেশপ্রেমিক পরিব্রাজককে তাহারা বিদায় দিতে আসিয়াছে আজ। কেহ লইয়া আসিয়াছে ধান্যদূর্ব্বা, কেহ বা পুষ্পমাল্য—শঙ্করের যাত্রাপথে তাহারা জানাইবে তাহাদের আশীর্ব্বাদ—প্রার্থনা করিবে তাহার সর্বাংগীন সফলতার জন্য। কী তাহাদের আকুলতা—কতখানি তাহাদের বিশ্বাস।

কিন্তু শঙ্করকে যে তাহার জন্মভিটাটুকু দেখিয়া যাইতেই হইবে। কেমন করিয়া সে ইহাদের বলিবে সেখানে যাইবার কথা। সে স্থান ত স্টেশনে যাইবার পথে পড়ে না। শঙ্কর চিন্তা করিল। একটু ভাবিয়া বলিল—তাহারা সকলে একবার 'বন্দেমাতরম্' গান গাহিতে গাহিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিবে, তারপর গ্রামলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইবে শঙ্কর।

সকলেই মহা-উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কি সীমাহীন নিষ্ঠা এই দেশব্রতীর। তৎক্ষণাৎ সকলে শঙ্করকে পুরোভাগে লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

শোভাযাত্রা আসিয়া পৌছিল শঙ্করের ভিটার নিকটে। জমিদার চন্দ্রবাবু সকলকে লইয়া সেই স্থানটায় উঠিয়া আসিলেন এবং শঙ্করকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, এই স্থানটাতেই সৎকর্ম-মন্দিরের নিজস্ব

বাড়ি তৈয়ার করিবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং টাকাও সংগ্রহ হইতেছে।

শঙ্কর চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার জন্মভূমিটুকু জঙ্গলপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গৃহখানি বহুদিন পূর্বেই ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং তাহার উপর গজাইয়াছে বড় বড় বনতুলসীর ঝোপ। যে পাতকুয়াটি হইতে শঙ্কর জল তুলিয়া রান্না করিত, তাহা বুঁজিয়া গিয়াছে, আর তাহারই গর্ভে জন্মিয়াছে একটা প্রকাণ্ড যজ্ঞডুমুরের গাছ। ঐদিকে তাহার বাল্যকালে যেখানটায় গোয়াল ছিল—বুধি-গাইটার পেটের তলায় বসিয়া শঙ্কর তাহাকে তাহার মাথার চুল লেহন করাইত, সেইখানে পাড়ার লোক মাটি কোপাইয়া পালং শাক বুনিয়া দিয়াছে।

চারিদিক দেখিয়া শঙ্কর বলিল, বেশ ত, বেশ হবে, সুন্দর হবে এখানে—গ্রামের মধ্যেই, অথচ বেশ ফাঁকায়—বেশ জায়গা, এইখানেই হ'ক মন্দির—কিন্তু জমিটা কি কেনা হয়েছে?

জমিদার চন্দ্রবাবু বলিলেন, না, এ জমির কোন মালিক নেই। এর মালিক আজ প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর গ্রামছাড়া, বোধহয় মারা গেছে।

শঙ্কর চমকিয়া উঠিল—মারা গেছে! তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, ওঃ, তা খুব ভাল কথা—তা আপনাদের মন্দির নির্মাণের তহবিলে আমি যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে যাই—দয়া করে নিন। গ্রামের সবাই জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। শঙ্কর পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া দশটাকার পাঁচখানি নোট দিল চন্দ্রবাবুর হাতে। গ্রামের সকলে আর একবার বলিয়া উঠিল—'বন্দেমাতরম্'। গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া গ্রাম-লক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া এবং গ্রাম-বাসীদের প্রীতির অভিনন্দন লইয়া শঙ্কর যাত্রা করিল পুনর্বার।

দুই পাশে নিস্তব্ধ ক্ষেতগুলি চাহিয়া দেখিতেছে, আঁকাবাঁকা রাস্তাটির উপর দিয়া চলিতেছে একজন পথিক, করুণ তাহার মুখখানি, ক্লান্ত তাহার চরণ দুইটি, তবু সে চলিতেছে আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া দেখিতেছে ফেলে-আসা গ্রাম।

ঐ দূরে এখনও দেখা যায়—রাণীগ্রাম ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া

যাইতেছে। এখনও তাহার শ্যাম-সায়রের উচ্চ পাড় দেখা যায়; সু-উচ্চ তালবৃক্ষের পাতায় পাতায় সূর্যকিরণ নাচিতেছে। সম্মুখে ঐ তরুবীথি-ছায়ায় প্রবেশ করিলে আর হয়ত দেখা যাইবে না। আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া যাক—ঐ শ্যামল কুঞ্জটি, যাহার প্রত্যেক বিংশবর্ষীয় বৃক্ষলতা এই পথিককে চেনে; তাহাদিগকে আর একবার শেষ নমস্কার জানাইয়া লওয়া যাক।

দূর হইতে কান পাতিয়া আর একবার শুনিয়া লওয়া যাক ঐ গ্রামের আনন্দকল্লোল। উহার অধিবাসীরা হয়ত এখনও উৎসব করিতেছে, তাদের গ্রামের মৃত শঙ্করের ভিটায় সৎকর্ম-মন্দিরের গৃহনির্মাণ করিবার জন্য আজই একজন দেশহিত-ব্রতী মহানুভব ব্যক্তি দান করিয়া গিয়াছেন পঞ্চাশ টাকা নগদ।

ঐ দেশসেবকের প্রতি শ্রদ্ধায় গ্রামের সকলের মাথা নুইয়া পড়িতেছে বার বার—হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাসিতে হাসিতে পথিকের চোখে জল আসিয়া গেল।

—

সুপ্তি

জীবনের অন্তর্নিহিত ধারাটি কোথায় গিয়ে মেলবে, কেউ কি তা জানে ?

শুষ্কমুখেই ফিরে এল অমিতাভ সন্ধ্যাবেলায়। মা ছেলের মুখ দেখেই বুঝেছেন, চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিছুই বললেন না তিনি। লাল খানিকটা চায়ের লিকারে খান দুই বাতাসা ফেলে মা দিলেন ছেলের হাতে। অমিতাভ একখানা জলচৌকীতে বসে ধীরে ধীরে তাই পান করতে লাগল।

বোবা ভাইটা ছোট বোনের সঙ্গে খেলা করছে উঠানে। ওরা কিছুই জানে না—মা আর ছেলের মনে কি দারুণ দুশ্চিন্তা। বোবা ভাই—বয়স তার দশ বছর, বোনটা বছর সাতেকের। অমিতাভ বাইশ পেরিয়ে তেইশে পড়ল—ঘরে আবার কিশোরী বধূ, কাজেই খাবার লোক পাঁচ জন, আর ঘরে চালের একটি দানা নেই।

অথচ বছর তিনেক আগেও অমিতাভ ছিল গ্রামের সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সন্তান ;—আদুরে ছেলে ; বি-এ পড়বার সময় বাপ মারা গেলেন, পাঠ্য-পুস্তকগুলো বিক্রী করে দিয়ে অমিতাভ বাড়ি এল। দেনার সমুদ্র—বছর খানেকের মধ্যেই সব গেল বিক্রী হয়ে। এখন শুধু ভদ্রাসন, তাও ডিক্রীজারি করে রেখেছে মহাজন কালীবাবু। হয়ত আবাল্যের এই ক্রীড়াভূমিটুকুও ছেড়ে যেতে হবে কোন সুদূর রাজ্যে অন্নের সন্ধানে। তাইবা কোথায় যাবে, ঠিক নেই।

চা খেতে খেতে অমিতাভ বোনটাকে ডাকলো কাছে। ভাইটিও এসে দাঁড়ালো। কথা বলতে না পারার দুঃসহ ব্যথা এখনো ভাল করে অনুভব করেনি ভাইটি ; সে জানে, দাদার কোলে ও নিশ্চিন্ত থাকবে। বোন আর ভাইকে একটু আদর করে অমিতাভ আবার বেরিয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে ডাকলো—মা।

আয় বাবা, বোস, কেন দুঃখ করছিস অমু—ভগবান ভাল দিন দেবেনই।

অমিতাভ নিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। বধূ কি রান্না করছে। রান্নার কিছু জুটেছে তা হলে। অমিতাভ একটু নিশ্চিন্ত হোল আজকের মত। দেখলো, বোন আর ভাই ময়দার পিঠে খাচ্ছে। পোয়াখানেক ময়দা তা হলে মা জুটিয়েছেন কোথাও—বেশ।

দুখানা ময়দার পিঠে আর একটু জল খেয়ে অমিতাভ শুয়ে পড়ল এসে। কত কি ভাবছে ও। বউ এসে পায়ে হাত দিল। টিপতে লাগল পা। অমিতাভ বললে, বেশী আরামে রাখিসনে আশা, শুয়ে পড়দিকি—খেয়েছিস?

—হ্যাঁ, বধূর চোখে জল যেন গড়াচ্ছে। অমিতাভ আদর করে ওকে তুলে নিল বুকের মধ্যে—দারিদ্রদগ্ধ জীবনে মা আর বৌ-ই ওর একমাত্র সান্ত্বনা। বৌ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর রাত্রে উঠে অমিতাভ একখানা চিঠি আশার আঁচলে বেঁধে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে।

তারপর·····

তিনটি টাকা মাত্র সম্বল—তাই কাল গ্রামের একটা ছেলেকে অক্সফোর্ড অভিধানখানা বেচে যোগাড় করেছে অমিতাভ। বিকেলে যখন নামলো হাওড়ায় তখন তার হাতে আছে মাত্র বারো আনা পয়সা। হেঁটেই গঙ্গা পার হয়ে সে এসে দাঁড়ালো মহানগরী কলকাতার বুকে। কোথায় যাবে এখন! একমাত্র নামচেনা লোক আছেন 'সন্ধানী' কাগজের সম্পাদক; তাঁর কাগজে গত মাসে অমিতাভের একটা কবিতা বেরিয়েছিল। সেইখানেই প্রথমে এল সে। কলেজ ষ্ট্রীটের একটা দোতলার ঘরে সন্ধানীর অফিস—চায়ের আড্ডা জমেছে। অমিতাভ সবাইকে নমস্কার করতেই ওকে সবাই বসতে বলে জিজ্ঞেস করলো—কি দরকার আপনার?

অমিতাভ পরিচয় দিল—সে অমিতাভ রায়—গত মাসে তার একটা কবিতা ছেপেছেন এঁরা। সম্পাদক অমিতাভের জন্য চা আনতে বলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কাগজ সে ঠিক পেয়েছে কিনা। অমিতাভ জানালো, পেয়েছে।

গল্প ওদের যেমন চলছিল, চলতে লাগল। চা এল অমিতাভের জন্য। শুধু এক পেয়ালা চা—সারাদিন সে কিছুই খায়নি। চা-ই খেল সে খালিপেটে। গল্পে, আলোচনায় যোগদান করলো অমিতাভ। রাত বেড়ে চলেছে। একজন শুধালো—কলকাতায় ক'দিন আছেন মশাই—দু'চার দিন থাকবেন তো?

—দেখি—বলে অমিতাভ মুখ নামালো। একে একে প্রস্থান করতে লাগল বন্ধুরা। সব শেষে সম্পাদক শান্তিবাবু যাবেন—বল্লেন, রাত হোল অনেকটা, আমাকে আবার সেই শিবপুর যেতে হবে।

অমিতাভ আর অপেক্ষা করতে পারে না। শান্তিবাবুকে একে একে সব কথা বলে ফেল্লে, শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,—বেশ, থাকুন এই অফিসেই আজ! কাল দেখা যাবে, কি করা যেতে পারে।

অমিতাভ অফিসের টেবিলটাতেই শুয়ে রাত কাটিয়ে দিল। সকালে একটা দোকানে দুটো বিস্কুট আর এক ভাঁড় চা খেল অমিতাভ। শান্তিবাবু দশটার সময় আসবেন, এতক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

'সন্ধানী' অফিসে বসে বসে অমিতাভ একটা ছোট গল্প লিখে ফেললো। শান্তিবাবু এলেন দশটায়। প্রথমেই একটা সিকি অমিতাভের হাতে দিয়ে বললেন, পাশের ঐ বাড়িটায় হোটেল আছে। আগে খেয়ে আসুন—স্নান করেছেন তো?

—না—করে নিচ্ছি।—বলে অমিতাভ বেরিয়ে গেল। কলের জল তখন ফুরিয়েছে। একটা ঘোড়া-গরুকে জল খাওয়াবার পাত্রেই মাথাটা ধুয়ে নিল সে। হোটেলে খেয়ে ফিরে এল।

—খেয়েছেন? শান্তিবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ, ভাই খেলাম। অমিতাভ দেখলো, তার লেখা গল্পটা পড়ছেন সম্পাদক।

—ভালই তো লেখেন আপনি! এই গল্পটা এবার ছাপবো, আর কিছু টাকাও দিতে পারবো আশা করি—গোটা পাঁচেক—বেশি তো নেই ভাই।

—যথেষ্ট ভাই; ঐ কে দেয়! বাড়িতে আমার বোবা ভাইকে নিয়ে মা উপবাসী।

শান্তিবাবু তৎক্ষণাৎ একটা মনি-অর্ডার ফর্ম বার করে বললেন—, বলুন তো ঠিকানা—টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করে দিচ্ছি, কালই পাবেন।

শান্তিবাবু পাঁচটা টাকা পাঠিয়ে দিলেন অমিতাভের মার নামে। অমিতাভ আকাশের দিকে তাকালো শুধু একটিবার।

—আপনি আমার সহকারী হয়ে থাকুন অমিতাভবাবু—পয়সা আমারও নেই; নিতান্ত গরীব লোক আমি, আপনার মার জন্য গোটা দশেকের বেশি টাকা দিতে পারবো না এখন—আর সাত টাকা আপনার হোটেল খরচ, টাকা তিন হাতখরচ কেমন? 'সন্ধানী'র আয় বাড়ান্, আপনার খরচও বাড়ান।

অমিতাভ আর একবার চাইলো আকাশের দিকে শুধু। চোখে ওর জল।

রাত্রি দশটায় শান্তিবাবু বাড়ি গেলেন। অমিতাভ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, ভাগ্য তার খারাপ নয়। কত লোক তো, শুনেছে সে, কিছুই যোগাড় করতে পারে না কলকাতায়, আর সে নিরাশ্রয় হয়েও এসেই আশ্রয় পেল, ভ্রাতৃস্নেহ পেল, চাকরিও পেল যা হোক্ একটা মাইনের—মন্দ কি! যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন বই কি!

কাল দশটার মধ্যেই মা টাকাটা পেয়ে যাবেন, ঐ সঙ্গে খবরও পাবেন। গত কাল থেকে হয়ত ওদের উপবাসেই কাটছে। আর কারো জন্যে অমিতাভ ভাবছে না, ছোট বোনটাও বুঝবে অবস্থাটা কিন্তু বোবা ভাইটা কিছুতেই বুঝবে না। কিছুই বোঝে না সে—খিদের সময় খেতে না পেলে চীৎকার করে পৃথিবী ফাটিয়ে দেবে, সুমুখে যা-

পাবে তাই ছুড়ে মারবে তার বোদকে। [illegible]
আশার ওপর। আবার দুটি খেতে পেলেই ও আশার পরম বন্ধু। ওর মত কেউ আর ভালবাসে না আশাকে। অমিতাভ তো ওর প্রাণ। দাদা ছাড়া আর কিছু জানে না শ্যামল—দাদা আর দাদা—মুখে কথা ফোটে না, বলে 'আদ্দা'। অমিতাভের মন ক্রন্দনাতুর হয়ে উঠলো ছোট ভাইটির জন্য। এত রাত্রেও অমিতাভ বাড়ি না ফিরলে সে জেগে থাকে। ঐটুকু ছেলে, পুঁটি মাছ ধরে নিয়ে আসে পুকুর থেকে, সব থেকে বড় ডিমভরা মাছগুলি বেছে বেছে দাদাকে দিতে হবে ওর বৌদির—নইলে শ্যামল কুরুক্ষেত্র করবে। সবই বোঝে শ্যামল, শুধু বোঝে না, তারা গরীব। সবারই বাড়িতে গরু বাছুর, ধান-চাল, জমি জায়গা, আর তাদের কিছুই নেই কেন, শ্যামলের বাক্‌হীন মন তা কিছুতেই বুঝতে পারে না। যাক্—কাল টাকাটা পেয়ে নিশ্চয়ই ওরা একটু পেট ভরেই খাবে, ভবিষ্যতের আশাও পাবে একটু। অমিতাভ পাশ ফিরে শুলো।

নাঃ, ঘুম কিছুতেই আসেনা। শান্তিদার কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে। চমৎকার ছেলে শান্তি-দা, অমিতাভকে যেন বুক দিয়ে নিল। নিজে গরীব, কিন্তু প্রাণটা কত মহৎ! যদি কোন দিন সুযোগ পায় সে তাহলে শান্তিদার ঋণ শোধ করবে! সুযোগ সে পাবেই, নইলে তাকে ঈশ্বর এনে ঠিক জায়গায় বসাবেন কেন? ঠিক—যে সাহিত্যসাধনাকে অমিতাভ চিরজীবনের ব্রত করে নিতে চায়, সেই ক্ষেত্রেই তো ওকে এনে দাঁড় করালেন ওর ভাগ্যদেবতা—সুযোগ দেবার জন্যই তো!

ঘুমিয়ে পড়ল অমিতাভ অনেক রাত্রে। ভোরে উঠে ওর মনে এল একটি পবিত্র প্রশান্তি। আর ঘণ্টা চার পরেই তো মা টাকা পাবেন। পাঁচটা টাকা কিছুই নয়, তবু আট-দশ দিন চলে যাবে ওদের, এর মধ্যে আবার চেষ্টা করে কিছু পাঠাবে শান্তি-দার কাছ থেকে নিয়ে।

হাতমুখ ধুয়ে অমিতাভ ভাবলো, চা খাওয়া ছেড়ে দেবে ও। আর তো কোন নেশা নেই, নাইবা খেল চা—কিন্তু চা খাওয়া ওর চিরজীবনের অভ্যাস। এতো কষ্টের মধ্যেও চা ভেজানো লাল জল খেয়েছে ওরা,

[illegible] পড়ল তার কথা, 'দুঃখে পড়ে অসমর্থ হয়ে কিছু ত্যাগ করা কাপুরুষতার অন্য রূপ—'। না, চা ছাড়বে না অমিতাভ। চা খাবার শক্তি যখন তার পূর্ণ মাত্রায় জন্মাবে তখন ছেড়ে দেবে চা সে। আজ নয়।

ফিরে এসে লিখতে বসল অমিতাভ। শান্তি-দা বলে দিয়ে গেছেন সম্পাদকীয় বিষয় সব লিখতে হবে। কিন্তু লেখবার আগে আজকের কাগজখানা পড়া দরকার। বিনিময় পত্রিকাস্বরূপ দৈনিক কাগজখানা দিয়ে গেল একজন। অমিতাভ খুললো কাগজখানা।

ঘাসের চটি পায়ে একটি তরুণী এসে দরজা থেকে বল্লে—এ সময় আপনি আজ?

মুখ তুলে চাইলো অমিতাভ। মেয়েটি কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বল্লে,—ও, আপনি শান্তিবাবু নন, তাঁর বন্ধু বুঝি?

—হ্যাঁ, অমিতাভের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। একি ফ্যাসাদ রে বাবা। কে এ? এমন বাঘ এখানে আছে, শান্তি-দা তো বলেননি কিছু? অমিতাভ কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলো না। নিতান্ত পল্লীগ্রামের ছেলে সে, চটিপরা আধুনিকা তরুণী দূর থেকে জীবনে দু চারজন মাত্র দেখেছে, কথা কখনো বলেনি। জিভখানা তার আড়ষ্ট হয়ে উঠল। ঘামতে লাগলো সে।

মেয়েটি ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপাশে বুককেসে রাখা একটি নতুন উপন্যাস টেনে নিয়েছে। কাল রিভিয়ু করতে দিয়ে গেছেন গ্রন্থকার। বইখানা দুএক পাতা উল্টে মেয়েটি বল্লে—নিয়ে চল্লুম বইটা পড়ে বিকালে দিয়ে যাব।

অমিতাভ ঘাড় নাড়লো। চলে গেল মেয়েটি। বাঁচা গেল, বাবা! কিন্তু! বইটা তো নিয়ে চলে গেল, যদি ফেরৎ না দেয় তবে চাইবে কার কাছে? ও কে? কিছুই জানা হোল না অমিতাভের। শান্তি-দা এসে হয়ত বকবেন তাঁকে। অমিতাভ দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই, শান্তি-দার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে তাকে।

শান্তি আসতেই অমিতাভ কথাটা বল্লে তাঁকে। শুনে শান্তি হেসে বল্লে,—ভূত চেপেছে তা হলে তোর ঘাড়েও। সাবধানে থাকবি, ও এই বাড়িওয়ালার মেয়ে, নাম কল্লোলিনী সেন, মেয়েটা বি-এ পরে। ওকে তুই মিস্ সেন বলিস—কিন্তু বেশি মিশবিনে ওর সঙ্গে বুঝেছিস?

অমিতাভ চুপ করে রইল। আশার কথা মনে পড়ল। ওর সেই শ্যামাঙ্গী কিশোরী বধূ—যার মনের মধু ওকে মুগ্ধ করে রেখেছে। এরা সুন্দরী খুবই, কিন্তু না, আশার মতো এরা মিষ্টি নয়। কিন্তু সুন্দরী—চমৎকার চেহারাখানা।

শনিবার দিন কি একটা ছায়াছবি মুক্তি পাবে একটা চিত্রগৃহে। তাই সমালোচনা করতে হবে কাগজে। শান্তি অমিতাভকে বল্লে, চল, দুজনে যাই। বেরুবে ওরা—মিস্ সেন এসে বল্লেন,—আমিও যাবো—আপনারা তো পাস পান? পাস ওরা নেয় না, ওরা সত্যি সমালোচনা করে, তাই টিকিট কিনে সিনেমা দেখতে যায়; কিন্তু অত কথা শান্তি কিছু না বলে মিস্ সেনকে আসতেই বল্লে। অহেতুক আনন্দে অমিতাভের মনটা উঠলো ভরে। মিস্ সেনের সান্নিধ্যের লোভ যেন ওর মগ্নচেতনার মধ্যে লুকোনো ছিল। এতদিন জোর করে অমিতাভ তাকে জেগে উঠতে দেয়নি—আজ সে মুক্তি পেয়েছে।

মিস্ সেন কাপড় বদলে এসে দাঁড়ালো—চলুন।

রূপের ঝলক তার সর্বাঙ্গে উপচে পড়ছে। কানের ঝুমকো দুটি যেন ওর চুলের চিকনতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লেগেছে; গলায় সুশুভ্র মসৃণতা, বাহুর নগ্ন মুক্তি এবং বক্ষের তরঙ্গায়িত লালসা অমিতের মনটাকে কী এক আশ্চর্য বিস্ময়ে অভিভূত করে তুললো। শান্তি ডাকছে, সে যেন শুনতেই পাচ্ছে না। শান্তি অমিতাভের কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে বল্লে—একেবারে পাড়াগেঁয়ে—চল্।

ওরা একটি ট্যাক্সি করে দৃশ্য গৃহের সম্মুখে এল। ট্যাক্সি অবশ্য মিস্ সেনের খাতিরেই, নইলে শান্তি বা অমিতাভের ট্যাক্সি চড়ার অবস্থা নয়। টিকিট কিনে ওরা ঢুকলো—শো আরম্ভ হয়ে গেছে।

চুপ করে বসল অমিতাভ। ওর মনে কল্লোলের রূপটা তখনো

নিবে যায়নি, জ্বলছে, চিত্রপটে নিবদ্ধ দৃষ্টি, কিন্তু মন ওর কিছুই দেখছে না। অকস্মাৎ একটা দৃশ্যে অমিতাভ চমকে উঠলো।

ঘটনাটা যে অভিনয়ের একটি ভূমিকা একজন কবির, কবি লীলাইত ভঙ্গীতে নাটকীয় সুরে এবং নিতান্ত গোবেচারার অনুকরণে কয়েকটি তরুণীর আদেশ পালন করছেন। কবি ভদ্রলোক যেন একটি সং—তেমনি তাঁর লম্বা লম্বা চুল, চশমা এবং চলন-বলনের ভঙ্গী। কবিকে এমনই দুর্বল ও অকর্মণ্য করে নাটকে চিত্রিত করা হয়েছে যে, সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ হাসির কলরোলে ভেঙে পড়বার যোগাড়।

রাগে অমিতাভের সর্বাঙ্গ রী রী করতে লাগল। কে ঐ হতভাগা নাট্যকার, যে নিজে কবি হয়েও কবি-চরিত্রের এতখানি অবমাননা করতে অপমান বোধ করলো না! তার কি গণ্ডারের চামড়া নাকি? না—তার চামড়াই নেই! নিজের নাক কেটে সং সাজতেও তার বাধে না। অমিতাভ পাশে-বসা শান্তিকে জিজ্ঞাসা করলো—নাট্য-কারের নাম কি? শান্তি জানালো—সরো মুখুজ্যে। আশ্চর্য হয়ে গেল অমিতাভ। বাংলার একখানি অতি পরিচিত কাগজে এই মুখুজ্যে-পুঙ্গব বহু লেখাই লিখেছেন, পড়েছে অমিতাভ, কিন্তু তিনি যে নিজের কথা বলেই এতকাল ভাঁড়ামি করে এসেছেন তা সে জানতো না। অমিতাভের লজ্জাবোধ হতে লাগল যে সে এই লেখককে শ্রদ্ধা করে। ইচ্ছা করছিল, নাট্যকারের পিঠে ঘা কতক চাবুক বসিয়ে দেয়।

—অমিতাভবাবু? ডাকলো মিস্ সেন—হাফ টাইম হয়েছে।

ঘাড় ফিরিয়ে অমিতাভ বল্লে—কি বলছেন, চা বা আইসক্রীম কিছু খাবেন?

—হ্যাঁ, বড্ড পিপাসা পাচ্ছে।

অমিতাভ উঠে চা-বয়কে ডাকতে গেল। মিস্ সেন শান্তিকে বললে, —আপনার বন্ধু বড্ড মেয়েদের দিকে তাকান, বড্ড লোভীর মতো!

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনিও সেটা চান বোধ হয়, নইলে বারণ করতে পারেন তো!

—বারণ করবো কি করে—ভদ্রতায় বাধে আমার।

অমিতাভ চা নিয়ে ফিরে এল। শান্তি অমিতাভকে গম্ভীরভাবেই বললে, তোর নামে অভিযোগ করেছেন মিস্ সেন, তুই বড্ড লোভীর মত ওঁর দিকে তাকাস্।

লজ্জায় আর সংকোচে লাল হয়ে উঠলো অমিতাভ। কি কথা বলবে সে? মিস সেন তাড়াতাড়ি বললে--না—না, মিঃ রায়, আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম। চায়ের কাপটা নিলো সে বয়-এর হাত থেকে। অমিতাভের লজ্জা কিন্তু কাটলো না। সেও তাহলে ঠাট্টার পাত্র। ঐ নাটকের কবির মতোই সেও তাহলে এর কাছে নিতান্ত একটা সং। অমিতাভের সর্বাঙ্গ জ্বালা করে যেন একটা উষ্ণ বাষ্প বেরুতে লাগল। ঘাম দেখা দিল ওর কপালে।

মিস্ সেন বল্লে—শান্তিবাবু, আপনি বড্ড কান ভারী করতে পারেন লোকের। অমিতাভবাবু কি ভাবছেন আমায়? আমি যেন সত্যিই বলেছি কিছু! —ওর কণ্ঠে চপলা বালিকার সারল্যময় স্বচ্ছতা। অমিতাভ ভাবলো, তা হলে ঠাট্টা করেই বলেছে, সিরিয়স নয়। মনটা যেন ওর মুক্তি পাচ্ছে ধীরে ধীরে। বললে, আপনার দিকে হয়তো আমি একটু তাকিয়েছি মিস্ সেন, অভদ্রতার অভিযোগ যদি তার জন্য শুনতে হয় তো আমি সাবধান হবো--কিন্তু এটা ঠাট্টার বিষয় নয়। বেশ, আমি আর তাকাবো না আপনার পানে।

—তাকাবেন না! কী বলছেন আপনি? এতখানি সর্বনাশের কারণ কি ঘটল?

—সর্বনাশ কি হোল? অমিতাভ ভয়ে বলল। যেন ভয়ানক কিছু অপরাধ করেছে সে।

—হোল না? আপনারা না তাকালে আমরা যাবো কোথায়! আপনাদের তাকিয়ে দেখবার জন্যই তো আমরা এত কষ্ট করে নিজেদের দ্রষ্টব্য করে তুলি! এত পয়সা খরচ করে স্নো-ক্রীম পাউডার লিপষ্টিক-নেলপালিশ, তারপর সাবান এসেন্স অডিকোলনে অঙ্গসেবা করি। এতো দামি দামি সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের জামা-শাড়ি-সেমিজ, জুতো ব্যবহার করতে হয়। এত ভালো ভালো গয়না পরে দিনরাত

সং-সাজবার বায়নাক্কা নিতে হয়—আপনারা শুধু তাকাবেন বলে; আর কিছু নয়।

কল্লোলিনী হাসিমুখে একটানেই কথাগুলো বলে এক ঢোক চা খেল—তারপর আবার বললে—মিছেই লেখাপড়া শিখেছেন আপনি; আপনি তাকান না ভালো করে, তাই বললাম যে তাকাবেন। উল্টো বুঝতে হয় মেয়েদের কথা—শিখে রাখবেন।

শান্তি চুপটি করে শুনছিল। অমিতাভ নির্বোধের মত বসে পড়ল। কি একটা বলা ওর উচিৎ ভেবে বললে—তাহলে এবার থেকে তাকানো উচিৎ হবে?

—হ্যাঁ, শুধু আমার পানে—আমারই পানে শুধু; বুঝলেন।

—না।

—মানে? বুঝলেন না কি আবার? না বুঝবার মত তো কিছু নেই। একমাত্র আমার পানেই তাকাবেন, আপনাকে লাইসেন্স দিচ্ছি আমি তাকাবার। আর কারো পানে তাকালে আমার পানে তাকানোর লাইসেন্স ক্যান্‌সেল হয়ে যাবে কিন্তু, মনে রাখবেন।

শান্তি বেশ বুঝলো—পাড়াগাঁয়ের এই গোবেচারা ছেলেকে কল্লোলিনী নাচাচ্ছে, অন্ততঃ নাচিয়ে মজা দেখতে চাইছে। এটা ওর এবং ওদের স্বভাব। কিন্তু বন্ধুকে বাঁচাতে হবে শান্তির। শান্তি শহুরে ছেলে, এসব ওর আজন্মের অভ্যাস। বললে—আপনিও কিন্তু আর কাউকে তাকাবার লাইসেন্স দিতে পারবেন না।

—বেশ, আমি রাজি। উনি শর্ত ভঙ্গ না করলে আমিও করবো না।

হাফ্‌ট ইম শেষ হয়ে গেল; আবার আধো আঁধারে শো চলছে। কল্লোলিনী মাঝে, দুপাশে শান্তি আর অমিতাভ। হঠাৎ কল্লোল বললে,—আপনি কিন্তু শর্ত ভঙ্গ করছেন—

—না—কৈ? কোথায়?

—করছেন। ঐ ফিরোজা রং-এর শাড়িটার দিকে তাকাচ্ছেন যে। প্রথম অপরাধ বলে আমি এবার মার্জনা করলাম।

অমিতাভ কখন তাকালো মনে পড়ছে না। শান্তি চুপ করে আছে। প্রায় শেষাশেষির সময় কল্লোল বললে—আপনার দু নম্বর শর্ত ভঙ্গ হোল, ঐ চাকার মত দুল দুটোর দিকে তাকাচ্ছিলেন আপনি। অন্ধকার, কিছু দেখতে পাননি বলে আমি এবারো মাফ্ করলাম।

শো শেষ হলে তিনজনে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছে বাইরে একটা শেড্‌ঢাকা গ্যাসপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কল্লোল বললে—দেখুন শান্তিবাবু, আপনার বন্ধু ঐ জরীর নাগরাজোড়ার দিকে তাকাচ্ছেন দেখুন, উনি তিন নম্বর শর্ত ভঙ্গ করলেন।

—এগ্রিমেণ্ট নাকচ হয়ে গেল তাহলে।

—নাঃ—মাফ্ করলাম আমি এবারও। তবে আবার যেন—ঐ-ঐ খরম-ঠ্যাং জুতোটার দিকে আবার তাকাচ্ছেন উনি—ওমা, ওমা, আবার ঐ শাড়ির ফাঁকে ঝুলে পড়া লাল পেটিকোটের দিকে—নাঃ, এগ্রিমেণ্ট আর টেঁকানো গেল না শান্তিবাবু। ছি। আপনার বন্ধুটি এমন লোভী।

—আপনার কথা উল্টো বুঝতেই তো বলেছেন, তাই তাকাচ্ছি। অমিতাভ বলে উঠলো।

—বাঃ, আপনার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম আমি। এতক্ষণে আপনি শহুরের মত কথা বলেছেন। শান্তিবাবুর এসোসিয়েশনের গুণ।

—আমার গুণ নয় দেবী, গুণ আপনার এসোসিয়েশনের। আমার সঙ্গে তো এই পনের দিন ঘর করছে, গ্রাম্যই ছিল—আজ আপনার সঙ্গে দু'ঘণ্টায় শহুরে হয়ে উঠলো।

—ও, তা হলে ক্রেডিট আমারই। আমার জয়ধ্বনি করুন।

ট্যাক্সি আসতেই চড়ে বসল ওরা।

মাস দুই-এর মধ্যে অমিতাভ বেশ দুরস্ত হয়ে উঠেছে শহুরেপনায়। কল্লোলকে সিনেমায় নিয়ে যেতে ও আর শান্তিকে ডাকে না।

কল্লোলেরা সঙ্গে দু-চার ঘণ্টা আলোচনা চলে। ইতিমধ্যে এল তেরশ' পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তর। যে পঞ্চাশ সালের কথা ইতিহাসে পড়বে ছেলেমেয়েরা—যে পঞ্চাশ সাল বাংলাদেশের বুকে মরণের বীথি সাজিয়ে গেছে। কুড়িটা টাকায় আর চলে না অমিতাভের। চলা অসম্ভব। তাছাড়া কল্লোলের পিছনে বেশ কিছু খরচ হয় ওর।

লঙ্গরখানার রিপোর্ট লিখছিল অমিতাভ সেদিন। বড় বড় ধনী মহাজনরা কে কত চাঁদা দিয়েছেন, কে কত জনকে খাওয়াচ্ছেন, কার কতখানি পুণ্য সঞ্চিত হোল—এই সব হিসেব করতে হচ্ছে ওকে। হঠাৎ কল্লোলিনী এল। চোখ তুলে চেয়ে অমিতাভ প্রশ্ন করলে—কি খবর?

—না-কিছু না। দেখতে এলাম, আপনি কি করছেন।

—ওঃ—অমিতাভ লেখায় মনোনিবেশ করলো। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে কল্লোল বলেই ফেলল—গোটা দশ টাকা দিতে পারেন? বাবার অসুখ—বড্ড মুশকিলে পড়েছি।

দ-শ টাকা! কোথায় পাবে অমিতাভ! টাকা দুই আছে ওর হাতে। তাও দেওয়া চলে না। দিলে নিজের কিছুই থাকে না। বললে,—অত তো নেই। এক-আধ টাকা দিতে পারি।

—আচ্ছা, যা পারেন দিন।

অমিতাভ দুটো টাকাই দিয়ে ফেললো। কাল ওর কি দিয়ে চলবে, ভাববার সময় পেল না। টাকা নিয়েই চলে গেল কল্লোল। অমিতাভ বসে বসে ভাবতে লাগল, এরা ভদ্রলোক, এরা লঙ্গর-খানায় যেতে পারে না, ভিক্ষাও করতে পারে না। এদেরই মুশকিল সব থেকে বেশী। লঙ্গরখানার রিপোর্ট আর বড় বড় লোকদের স্তাবকতাপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রশস্তিটা ওর চোখের সামনেই রয়েছে—ওরই নিজের লেখা। এখনি লিখলো। মানবতার যুগসন্ধিতে মাননীয় ঐতিহ্যকে যেন বিদ্রূপ করলো।

ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে গেল। মা লিখেছেন—ওঁরা না খেয়েই বেঁচে থাকবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন কিন্তু বোবা ভাইটার বড্ড অসুখ! অমিতাভ যেন কিছু টাকা নিয়ে শীঘ্রই বাড়ি যায়। ভাইটি খুঁজছে ওকে।

যে দুটি টাকা ছিল তাও ধার দেওয়ার বিলাসিতা করেছে অমিতাভ, কিংবা দান করার মোহ যে কতটা তার হয়েছে ঐ কল্লোলের উপর, তা এই কিছুক্ষণ আগেও অমিতাভ বোঝেনি। এখন কি আর করবে ও। টাকা আর পাবে কোথায়। আশার গয়নাগাঁটি যা ছিল সব অনেক আগেই তা বিক্রী হয়ে গেছে। ভাইটার কি তাহলে চিকিৎসাই হবে না! মহাচিন্তায় পড়ল অমিতাভ!

কখন অপরাহ্ন হয়ে গেছে, সুসজ্জিতা কল্লোল ঘরে ঢুকে বলল, —উঠুন, সারাদিন আর লেখাপড়া করে না। চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি। সোনার হরিণী কল্লোল ডাকছে, কিন্তু বেড়াতে যাবে কি নিয়ে। অমিতাভের পকেটে একটা মাত্র ডবল পয়সা আছে। কিন্তু কল্লোল ডাকছে। পথে পথেই খানিক ঘুরে আসব। অমিতাভ পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে বেরুলো। হাঁটতে হাঁটতে একটা পার্কের কাছে এল ওরা। কয়েকজন মরে পড়ে আছে, কয়েকজন এখুনি মরবে। তবু বাঁচবার জন্য কি তাদের চেষ্টা! ক্ষীণ কণ্ঠে তখনো চাইছে, দা-ও বাবা কিছু।

অমিতাভ ডবল পয়সাটা দান করবে ঠিক করলো। শেষ সম্বলটুকু দান করে ও আজ ওর অমিতাভ নামের মর্যাদা রাখবে। কিন্তু কাকে দেবে। সবাই দীনাতিদীন—এতো দারিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতমকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অমিতাভ পকেটের মধ্যে সেই ডবল পয়সাটাকে ধরে আছে হাত ঢুকিয়ে। যোগ্যপাত্র পেলেই দিয়ে দেবে।

ঐ পার্কের দরজার সামনে একটা পশ্চিমা ডালভাজা বিক্রী করে। কল্লোল বললে—কিনুন তো দু পয়সার।

অমিতাভ এক মিনিট ভাবলো—পয়সাটা তাহলে কল্লোলকেই

দান করতে হবে। হ্যাঁ, এই তো সত্যি সুপাত্র দানের। কারণ একে দান না করার কোন উপায়ই নেই আর।

ডবল পয়সাটা দিয়ে ডালভাজা কিনে দিল অমিতাভ। তারপর একটা বেঞ্চে বসে কল্লোল খাচ্ছে—হাতের দু'আঙুলে কয়েকটা দানা নিয়ে অমিতাভের দিকে এগিয়ে দিল—নিন। হাত পেতেই নিল অমিতাভ—না নেবার উপায় নেই। খেতেও হবে—খেতে যাচ্ছে—উঃ উঃ উঃ শব্দ। একটা খোঁড়া ছেলে, মুখখানা লালায় ভর্তি, দুচোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি দিয়ে চাইছে অমিতাভের হাতের ডালভাজা কয়টা। উ-উ-উ···।

– বেরো, বেরো এখান থেকে—কল্লোল গর্জন ছাড়লো। ছেলেটা শুনতেই পাচ্ছে না। লালাভরা মুখটা কল্লোলের জুতোপরা পায়ে ঘষতে যাচ্ছে। কল্লোল ঠেলে দিলে ওকে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল ছেলেটা। অমিতাভ হঠাৎ তড়াক করে উঠে ছেলেটার লালাভর্তি মুখে ডালের দানাকটা ফেলে দিয়ে বললে—খা। খা।

ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে—অমিতাভ কেঁদে ফেলল।

ছেলেটা বোবা। ওর ছোট ভাইটার মতই বোবা।

—

বধূ

উনিশ বছরে পড়লো উর্মিলা।

ওরা দু'বোন। বড় উৎপলার বিয়ে হয়ে গেছে বছর তিনেক আগেই। উর্মিলা তখন আই, এ, পড়ছিল। বি, এ, পাস করার পর ওর বাবা ওর বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন এক মফঃস্বল শহরে। মফঃস্বল হলেও শহর—তাই খুব বেশী নিরাশ হলো না উর্মিলা—বরঞ্চ ভালোই বর হবে শোনা যাচ্ছে। বি. এ. পাস, চাকরীর চেষ্টায় আছে। বাপের অবস্থাও নাকি খারাপ নয়—অর্থাৎ যোগ্য পাত্র।

ওর আজ বিয়ে। রসুনচৌকীর বাজনার তালে তালে বুকের ভেতরে গান বাজছিল মিলার। জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন আজ; এদিনে তরুণী মনের কাব্য-কলিকার মাধুর্য বর্ণনার অতীত। কিন্তু বাইরে কি যেন গোলমাল শোনা গেল। মিলা কিছুই বুঝতে পারছে না। কি হোল? ওর পাশে যেসব বান্ধবী ছিল ক'নে সাজাবার জন্য, তারাও বাইরে চলে গেল—কেউ-ই ফিরছে না। মিলা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে রইল খবরটা পাবার আশায়।

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে উর্মিলা; কিন্তু দু'টি মাত্র মেয়ে। তাই ওর বাবা ওদের খুব ভালোভাবেই মানুষ করেছেন। কলকাতার শহর-তলীতে বাড়ি, তাই শহরের সব সুযোগ-সুবিধাই ওদের আছে। উর্মিলা একা বাস ধরে মেয়ে-কলেজে গিয়ে বি, এ, পাস করলো। একটা

সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে গানও শিখেছে এবং পাড়ার মেয়েদের নিয়ে অ্যামেচার থিয়েটারও করেছে কয়েকবার। অর্থাৎ আপ্-টু-ডেট হবার চেষ্টারও ত্রুটি করে নি। চেহারাখানাও ওকে ভালই দিয়েছেন ওর গঠন-বিধাতা; এখন ভাগ্যবিধাতা কি করেন, দেখা যাক।

কিন্তু বাইরে হুলুস্থুল—বাবার গলা, মার কান্না আর আত্মীয়দের হাঁক-ডাক শুনে উর্মিলা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। শেষে সে আর থাকতে না পেরে সটান এসে দাঁড়ালো বাইরে।

দেখলো – ওর বাবা হতাশ হয়ে বসে পড়েছেন আর মা মূর্চ্ছা গেছে। সর্বনাশ! কি এমন হোল? ওর দিদি মাকে পাখা করতে করতে নিজের স্বামীকে বলছে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—

—আর সবার মতন তুমিও দাঁড়িয়ে সং দেখছো নাকি! যা হয় একটা উপায় কর! বাবার ছেলে নেই—ছেলের কাজ তোমাকেই তো করতে হবে!

সুদর্শন চেহারার যুবকটি দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোচ্ছে। অকস্মাৎ সেই দেখতে পেল উর্মিলাকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে,—

—এই, তোকে উঠতে নেই। যা যা বসগে পিঁড়িতে—বলেই সে উর্মিলাকে ধরে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। উর্মিলা অসহায়ভাবে প্রশ্ন করলো; কি হয়েছে জামাইদা?

—কি আর হবে। আমার বরাতেই আছিস তুই—দে, মালাটা আমারই গলায় দিয়ে দে···বলে হাসলো সে।

—এই কি রসিকতার সময় জামাইদা? কি হয়েছে, বলুন শিগ্‌গীর। উর্মিলা কাতরভাবে ওর পায়ে হাত দিতে যাচ্ছে। কেমন যেন করুণা জাগলো যুবকের। তবু রসিকতা করেই বলল—শ্যালিকা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সখী—তার সঙ্গে রসিকতা সব সময়েই করা চলে—

—কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছে? মার মূর্চ্ছা—বাবার ওরকম অবস্থা!···

—যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার কথা, তিনি নাকি আজ সকাল থেকে পলাতক—

অ্যাঁ—উর্মিলা যেন আঁতকে উঠলো···কেন ?

—এইমাত্র খবর নিয়ে লোক এল—তিনি নাকি নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে করবেন না। হয়তো ভেতরে আরো কিছু গণ্ডোগোল আছে—কে জানে।

কি হবে জামাইদা ? উর্মিলার চোখের দৃষ্টিতে ব্যাকুল অশ্রু।

—ছোকরার বরাত খারাপ—নইলে তোমার মত রূপসী—যাক ভাবনা কি। আর কেউ না আসে, আমি তো আছি। দু'বোনকে ভাত দেবার ক্ষমতা আমার—

—রঙ্গরস আপনি এখন থামান জামাইদা, বাবাকে দেখুন—মাকে দেখুন—আমার যা হবার হবে। যান, দেখুন গে—উর্মিলা যেন ঠেলে বের করে দিল তপেশকে।

তপেশ তবু বলে গেল, তৈরী হও, আমার গলাতেই শেষ অবধি মালাটা পড়বে মনে হচ্ছে।

তপেশ চলে যাওয়ার পর উর্মিলা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল একা ঘরখানার মধ্যে। সুসজ্জিতা উর্মিলার মনে হচ্ছে এই বেশ, আবরণ-আভরণ, মাল্য-চন্দন সব নির্মমভাবে ঝেড়ে ফেলে দেবে। এ কি ভাগ্য তার। একি বিড়ম্বনা। দূর মফঃস্বল শহরে কেন যে বাবা বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। কলকাতার ছেলে হলে নিশ্চয় এমন অন্যায় আচরণ করতো না। বিয়ে যদি সে নাই করবে তা আগে বলে নি কেন। তাকে বিয়ে করবার জন্য মিলা তো কাঁদছিল না। এখন কি হবে। বাবার অবস্থা ভাবতে গিয়ে উর্মিলা অসহায় ভাবে বসে পড়ল আবার পিঁড়িটার উপর।

ধিক্। বাঙালীর মেয়ের মত এমন অসহায় অবস্থা হয় তো আর কোন দেশে কারও নেই। কিন্তু বাঙালী মেয়েরও তো বিয়ে হচ্ছে আকছার। এমন কার বরাতে হয় ? কি দোষ করেছে উর্মিলা তার উনিশ বছরের জীবনে, যে ভাগ্যের এমন নিষ্ঠুর পরিহাস।

কিন্তু ওর নামটাই দোষ করেছে—ভাবতে লাগলো উর্মিলা—সীতা

আর উর্মিলা নামের মেয়ে কদাচিত সুখী হয়। এ যেন নামের গুণ, নইলে দিদির বরাতে অমন সুন্দর বর জুটলো, আর তার বরাতে···

হঠাৎ উর্মিলা শুনতে পেল—জামাইদা মা-বাবাকে বলছেন, আপনি ভাববেন না মা—আমার এক বন্ধুর কথা হঠাৎ মনে পড়ল। দেখি যদি তাকে আনতে পারি। সে যদি হয় তো মিলার জোর বরাত···আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি আসছি।

পাশের জানালা দিয়ে উর্মিলা দেখতে পেল—রাস্তায় রাখা একখানা মোটরে উঠে তপেশ অদৃশ্য হয়ে গেল মোড়ের মাথায়। কে জানে, কাকে ধরে আনবে। তবে তপেশের বন্ধু নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু হবে না। উর্মিলা দুরুদুরু বুকে বসে রইল ভগবানের নাম নিয়ে।

* * * *

বড় রাস্তায় এসেই হাতঘড়িটা দেখলো তপেশ—পৌনে বারো। একটা পঁয়ত্রিশে আর একটা লগ্ন আছে বিয়ের। ড্রাইভারকে তাগাদা দিল,—চালাও জলদি।

ব্যারাকপুর থেকে বালীগঞ্জ জমিরুদ্দিন লেন—দূরত্ব কম নয়। তবে গভীর রাত্রের ফাঁকা রাস্তা—আর গাড়ীখানাও ভাল। ঘণ্টায় ত্রিশ চল্লিশ মাইল বেগে তপেশ এসে পৌঁছাল প্রকাণ্ড বাড়িটার সম্মুখে। দরোয়ানরা শুয়ে পড়েছে। মোটরের ইলেকট্রিক হর্ণ শুনে একজন বেরিয়ে এসে গেট খুলে দিল। তপেশ তাকে প্রশ্ন করলো—দাদু কোথায়? শুয়েছেন নাকি?

—জী হ্যাঁ—

—দেবু?

—স্টাডিমে হ্যায় হুঁজুর···

তপেশ আর কিছু না বলে সটান এসে ঢুকলো নীচেতলার একটি ঘরে—বিস্তর আলমারী ভর্তি বই, হোয়াট নট আর প্রকাণ্ড টেবিলের একধারে বসে একটা লোক মস্ত মোটা একখানা বই পড়ছিল

চুলদাড়িতে মুখ ভর্তি, তবে জামাকাপড় বেশ ফর্সা আর বয়সও কাঁচা—কিন্তু তার হুঁশই নেই যে ঘরে অন্য কেউ ঢুকেছে। অবশ্য তপেশের জুতার শব্দ হচ্ছিল না, কারণ ক্রেপ সোল। একেবারে টেবিলের কাছে এসে তপেশ ডাকলো—

—দেবু।

—অ্যাঁ। যেন চমকে উঠলো দেবেশ। তারপর সামলে বলল, —কি ব্যাপার? এত রাত্রে? সব ভালো তো রে তপু।

—হ্যাঁ, ভাল, খুবই ভাল। আমার শালীর বিয়ে, আজ, এখুনি: কিন্তু তোকে নিমন্ত্রণ করতে ভুল হয়ে গেছে। উৎপলা গালাগালি দিয়ে বলল, তোকে যেমন করে হোক নিয়ে যেতেই হবে—চল।

—এখুনি।

—হ্যাঁ, বিয়ে তো এখুনি—যেমন আছিস্, অমনি চল—নইলে বিয়েটাই দেখা হবে না।

—সে কি রে। কাপড়-জামা বদলাতে হবে—তাছাড়া দাদু হয়তো শুয়েছেন—

—নিমন্ত্রণে যেতে দাদুর পারমিশন্ নেবার তোর আর বয়েস নেই দেবু, অনেক বড় হয়েছিস্—আর জামাকাপড় এখানে না থাকে তো আমার ওখানে আছে—চল্, বদলে নিবি ওখানেই—হাতঘড়িটা আবার দেখলো তপেশ—সাড়ে বারো—চল্—ওঠ্।

হাত ধরেই টেনে তুললো তপেশ ওকে। চটিপরা পায়েই উঠে দাঁড়ালো দেবেশ। কিন্তু হেসে বলল,—তোর বৌ-এর সঙ্গে তো আমার আলাপই নেই। তিনি হঠাৎ আমার জন্য এত ব্যস্ত হলেন কেন রে তপেশ?

—কারণ, তোর গুণগানের কথা আমার কাছে শুনেছেন কি না। শুনেছেন যে নিজেকে লুকিয়ে না রাখলে তুই একটা 'বিশ্ব-বিস্ময়' হতে পারতিস। তাই তোকে তার দেখবার সাধ।

—ও। আর কি শুনেছেন?

—দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমার হাতেই সেখানকার সব ভার রয়েছে—বুঝলি ?

আর কথা না বলে টেনে ওকে গাড়িতে তুলে তপেশ বসল পাশে —সিগারেট ধরিয়ে বলল,—আরও শুনেছেন যে তুই কালো মেয়েকে মোটেই দেখতে পারিস না।

—মিছে কথা! আমি কালো মেয়েদের জন্য সব সময় দুঃখ বোধ করি—

—ঐ, তার মানেই তাই—

—তোর বৌ কালো নাকি ?

—চল না! শুভদৃষ্টি হলেই দেখতে পাবি—

—শুভদৃষ্টি কিরে! দেবেশ খুব গুরুতর ভাবে না হলেও যেন কিছু একটা সন্দেহ করে বলল—কি মতলবে আমাকে এমন করে তুই টেনে নিয়ে যাচ্ছিস তপেশ ? তোর বৌ আমার গুরুজন; শুভদৃষ্টি কি ?

—বৌ-এর বোনের সঙ্গেও তো হতে পারে শুভদৃষ্টিটা—বলে তপেশ নির্বিকারভাবে ধোঁয়া ছাড়লো।

গাড়ি তড়িতগতিতে ছুটছে বড় রাস্তায়।

দেবেশ নিরুপায়ের মত একবার নিজের বেশভূষার পানে চাইল —তারপর বাইরের রাস্তার পানে। ধীরে ধীরে বলল—তোকে বিশ্বাস করে এই রাত্রে বেরিয়েছি। দেখিস, শেষ পর্য্যন্ত ডুবিয়ে দিস নে।

—না, ভাসিয়ে দেব।.....একেবারে উর্বশীর কুঞ্জে গিয়ে ঠেকাব।

—ব্যাপার কি তপেশ—এমন হেঁয়ালি ঢংএ কথা বলছিস যে ?

—আর পাঁচ-সাত মিনিট পরেই জানতে পারবি—ভয় নেই—তোকে অকুল সমুদ্রে ভাসাচ্ছি না—নিতান্ত একটা বে'—একটা উপসাগর—অবশ্য বে-তে ঢেউ বেশী হয়। তা'হোক—সুন্দর দেখতে। হাসলো তপেশ।—মানে পুরীর সমুদ্র আর কি!

—কিন্তু তপেশ—আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে—

—নিঃসন্দেহ করে দিচ্ছি—হাতের সিগারেটটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে তপেশ বলল—আমার শ্যালিকা শ্রীমতী উর্মিলার আজ বিয়ে, কিন্তু আসানসোলের সেই অভাগা ছোকরাটি উপার্জন না করে বিয়ে করবে না বলে—কোথায় পালিয়ে গেছে। তার বাবা মিনতি জানিয়ে এবং মামা প্রার্থনা করে খবর দিয়েছেন যে তাঁরা নিরুপায়। এখন আমার অসহায়া শ্যালিকাটির ভার তোমাকে নিতে হবে—বুঝলে দার্শনিক? এ ছাড়া কোন উপায় নেই—আয় নেমে আয়।

—কিন্তু আমার দাদুর মত···একি কাণ্ড তপেশ!

—দাদুর মত আমি বুঝবো—তপেশ বলল—সেজন্য তোর কিছু ভাবনা নেই দেবু—তিনি তোর বিয়ে অবিলম্বে দিতে চান, আমি জানি। আর তুই তো একটা দর্শনের পোকা—তোর মতের আবার মূল্য কি!

ইতিমধ্যে বাড়ির সবাই এসে পড়েছে গাড়ীর চারিদিকে ভিড় করে। লগ্নের আর দেরী নেই। উর্মিলার বাবা দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, এসো বাবা—এসো, আমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার কর—আজ আমি বড় দায়ে পড়েছি বাবা—

ওঁর চোখে জল! দেবেশ ভাববারই সময় পেল না—কখন তাকে বরের আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিয়ে হয়ে গেল।

* * *

বিরাট বাড়ি এবং বিস্তর সম্পত্তির মালিক দাদুর একমাত্র উত্তরাধিকারী দেবেশ। মা বাবা হারা দেবেশকে সাত বছর বয়স থেকে তিনি মানুষ করেছেন। দর্শনশাস্ত্রে এম, এ, পাস করেছে দেবেশ—এখনো বিদ্যার পিপাসা ওর মেটে নি -পড়ছে আর পড়ছে। কিন্তু দাদু এবার বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি প্রায়ই বলেন—বিদ্যের পাহাড় হলি -এবার একটা অবিদ্যা আন্—নইলে আমি বাণপ্রস্থে যাচ্ছি!

—এই যে দাদু—এই ডক্টরেটটা হয়ে নিয়েই তোমার জন্য বরমাল্য সমেত বরনারী এনে দেব—বলে দেবেশ পালায় পাঠকক্ষে।

এইভাবে চলছিল এতকাল। কিন্তু আজ সকালে উঠে দাদু বিশ্বম্ভরবাবু একমাত্র নাতিকে শয্যাগারে অথবা পাঠকক্ষে না দেখে, অতিশয় চিন্তিত হয়ে অনুসন্ধানে জানলেন গত রাত্রে দাদাবাবুর বন্ধু তপেশদার সঙ্গে বাইরে গেছেন—এখনো ফেরেন নি। তপেশের সঙ্গে গেছে শুনে দাদুর দুঃশ্চিন্তা অনেকটা কমলো, তবু তিনি ভাবতে লাগলেন—ওরা গেছে কোথায়? তবে বেশীক্ষণ চিন্তার মধ্যে তাঁকে থাকতে হোল না—একখানা ট্যাক্সিতে করে তপেশ এসে ঢুকলো—নেমে দাদুকে একেবারে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বলল - অপরাধ যদি হয়ে থাকে তো মার্জনা করতে হবে দাদু।

—কলাচুরি না কি কামিনী কাঞ্চনের ব্যাপার, না জেনেই মার্জনার কথা তো ওঠে না। অপরাধটা কি মানুষ চুরি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—বলে তপেশ কিঞ্চিৎ থেমে বলল—গতরাত্রে দেবেশকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার সুন্দরী শালিকা শ্রীমতী উর্মিলার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে ফেলেছি—দেবেশ এখনো বাসরঘরে ঘুমুচ্ছে।

—অ্যাঁ! এমন নিদারুণ অপরাধ! এর কি মার্জনা আছে!—বলে দাদু একেবারে লাফিয়ে উঠলেন—বললেন, শাঁক বাজাতে হবে, উলু দিতে হবে, বধূ বরণ করতে হবে—কে এসব করবে, শুনি? বাড়িতে দুটো মেয়ে ডাকবার অবসর দিলে না তুমি।

—আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করছি দাদু—বলেই তপেশ উঠে টেলিফোন ধরে যেখানে যত আত্মীয়কে ফোনে পাওয়া যায়, খবর দিল আর দাদু ইতিমধ্যে চাকর-দারোয়ান নিয়ে বাদ্য বাজনা—আর বাড়ি সাজানোর ব্যবস্থা করে ফেললেন। আনন্দে চোখে জল আসছে দাদুর। তপেশকে বললেন—তুই যে-ভাবেই হোক, দেবেশের বিয়ে দিতে পেরেছিস, এর জন্যে ধন্যবাদ। তোকে প্রাণভরে আশীর্বাদ আমি করছি। চল্, ঘরের বউ ঘরে নিয়ে আসি।

অতঃপর দাদু স্বয়ং তাঁর বিরাট ক্যাডিল্যাক মোটর নিয়ে বউ

আনতে গেলেন এবং উর্মিলা আর দেবেশকে নিয়ে ফিরে এলেন। যথারীতি বধূবরণ হয়ে গেল।

—তোমার বউ পছন্দ হয়েছে দাদু—দেবেশ প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ, খুব! দাদু বললেন এবং উর্মিলাকে নিয়ে মহানন্দে রসিকতা আরম্ভ করলেন। দেবেশ আবার তার পাঠকক্ষে জটিল দর্শনতত্ত্ব আলোচনায় নিবিষ্ট হয়ে গেল।

বউভাত ইত্যাদি চুকে গেলেও উর্মিলার সঙ্গে দেবেশের বিশেষ আলাপ-পরিচয় ঘটবার অবসর হোল না। ফুলশয্যাও অবশ্য হয়েছে কিন্তু দেবেশ যখন এল তখন উর্মিলার দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। কোনরকমে দু'একটা কথা কইতে কইতেই সে ঘুমিয়ে গেল। দেবেশও বাঁচলো যেন। এর পর উর্মিলা থাকে উপরে আর দেবেশ থাকে তার পাঠকক্ষে। মাঝে থাকেন দাদু—উর্মিলার যা কিছু কথাবার্তা সব দাদুর সঙ্গেই। দাদু সঙ্গীতজ্ঞ। উচ্চাঙ্গের রাগরাগিণী এখনো চর্চা করেন যথারীতি। উর্মিলাকে তাই শেখাতে আরম্ভ করলেন। উর্মিলাও গান ভালবাসে—বেশ আনন্দেই কাটছে দিন তার দাদুর সহচর্যে—গানও ভালই শিখছে সে।

নিজের বরকে নিজে না দেখা পর্যন্ত কোন মেয়েই স্থির থাকতে পারে না, কিন্তু দেখবে কেমন করে উর্মিলা। বিয়ে হোল যার সঙ্গে তার পোষাক-পরিচ্ছদ মোটেই বরের মত ছিল না। একমুখ দাড়ী, লম্বা চুল আর চোখে চশমাওয়ালা বরকে দেখে উর্মিলার মনে হয়েছিল, খুব বেশী বয়সের কারো সঙ্গে ওর বিয়ে হোল হয়তো। ফুলশয্যার রাত্রে সে ভুল ওর ভাঙলেও আলাপ পরিচয় ঘটলো না এবং পরদিনই সকালে দেবেশ জরুরী কি এক কাজে এলাহাবাদ চলে গেল। ফিরে এল আবার সেই একমুখ দাড়ী আর বিশ্রী জামাকাপড় পরে। তবু উর্মিলা তাকে চিনতে পারতো। কিন্তু দেবেশ তার নীচের পাঠকক্ষেই কাটায় বইএর স্তূপ সামনে রেখে আর উর্মিলা সেতার নিয়ে তার ঘরে অথবা বসবার ঘরে দাদুর সঙ্গে যথারিতি সঙ্গীত চর্চা করে। দাদু মাঝে মাঝে বলেন,—তুমি এখন আমার সঙ্গেই প্রেমালাপটা করে

নাও মিলা, বেশ দুরস্ত হয়ে গেলে দেবেশের সঙ্গে ভাল জমাতে পারবে।

হাসে উর্মিলা কিন্তু দাদুই আবার বলেন—ডক্টরেট না হওয়া পর্যন্ত ও তোমার যোগ্যই হচ্ছে না—তাই দেখা করে না।

উর্মিলা অন্য কিছু না বলে একটা বড় রাগিনী আলাপ করতে অনুরোধ করে দাদুকে। দাদু আরম্ভ করেন—পটমঞ্জরী।

রাগরাগিণী নিশ্চয়ই খুব ভাল বস্তু কিন্তু উর্মিলা ক্রমশঃ অশান্ত হয়ে উঠছে। প্রায় একমাস তার বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে দুবার সে বাপের বাড়ি গেছে আর দেবেশ গেছে এলাহাবাদ এবং দিল্লী। আজ বাপের বাড়ি থেকে ফিরে আবার উর্মিলা শুনলো—দেবেশ নাকি কি এক দর্শন সভায় যোগ দেবার জন্য ইজিপ্ট চলে গেছে সকালের এরোপ্লেনে। মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল ওর। কিন্তু দাদু আদর করে বললেন—তোমার যোগ্য হবার জন্যই ও চেষ্টা করছে মিলা—দিনকতক অপেক্ষা কর ভাই! কি আর করবে বল। আপাততঃ এই বুড়োকে দিয়েই কাজ চালাও!

তানপুরাটা টেনে নিলেন তিনি।

নিরুপায় উর্মিলার নিঃসীম অভিমানটা গিয়ে পড়ল দেবেশের উপর, কিন্তু কি সে করবে। অতঃপর সঙ্গীতচর্চাতেই সর্বান্তঃকরণে মনোযোগ দিল। ওর সুমিষ্ট কণ্ঠের সঙ্গীত সত্যিই শোনবার মত। দাদু শিক্ষা দিতে দিতে ভাবতেন, এ কণ্ঠ সত্যই অপূর্ব।

ওস্তাদ বলে দাদুর পরিচয় আছে; বড় বড় গানের আসরে তাঁর নিমন্ত্রণ হয়। এমনি একটা নিমন্ত্রণ সভায় তিনি উর্মিলাকে নিয়ে গেলেন সঙ্গে। ওর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল শ্রোতাগণ। উর্মিলা বহু রসজ্ঞ শ্রোতার পরিচিতা হয়ে উঠলো। এর পর মাসখানেকের মধ্যেই বহু সভায় এবং বহু জলসায় যোগদান করতে লাগলো উর্মিলা। গোড়ায় দাদুর সঙ্গে, তারপর একাই যেতে আরম্ভ করলো। মাস দুই পরে দেবেশ যখন ইজিপ্ট থেকে ফিরে এল তখন উর্মিলা সর্বজন পরিচিতা সুগায়িকা। ওর গান সিনেমার ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক হিসেবে নাম করেছে—গ্রামাফোন রেকর্ডে সে-গান ঘরে ঘরে এবং রেডিও কর্তৃপক্ষ বিশেষ

বিশেষ দিনে ওকে দিয়ে গান করান। চারিদিক থেকে ডাক আসে—বাড়ির গাড়ী আর পুরোনো ঝিকে নিয়ে উর্মিলা যায় নানা জায়গায়। দাদু সব জায়গায় সঙ্গে যেতে পারেন না। অন্তঃপুরচারিণী উর্মিলা অতি অল্প দিনেই বহির্মুখী বৃত্তিতে অভ্যস্থা হয়ে গেল অশনে-বসনে-আচরণে।

স্বামীকে না পাওয়াব দুঃখ মনেই আসে না আর এখন। বাইরের সহস্র স্তাবক ওকে গৌরবের তুঙ্গ শৃঙ্গে তুলে ধরেছে। কাগজগুলোতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বের হয়—ছবিও কয়েকটা বেরিয়ে গেল এর মধ্যে। উর্মিলা এখন নামকরা একজন সোসাইটি গার্ল এবং সুবিখ্যাত গায়িকা। বাইরের বড় বড় সামাজিক কাজেও ওর নিমন্ত্রণ হচ্ছে—বহু নারী-প্রতিষ্ঠানের ও সভ্যা এবং বহু ব্যক্তির সঙ্গে ওর আলাপ।

এই ভীষণ ভীড়ের মধ্যে বেচারা দেবেশের প্রায়-না-দেখা মূর্তি কোথায় তলিয়ে গেল। দাদুও প্রায় চাপা পড়ে গেলেন। ইদানিং এমন অবস্থা হয়েছে যে উর্মিলার বাড়ি ফিরতে রাত্রি সাড়ে-এগারটা তো হয়ই, কোনো কোনো দিন রাত্রি বারোটা পার হয়ে যায়। অহিফেন সেবি দাদু তখন শুয়ে নিদ্রায় আছন্ন থাকেন। উর্মিলা নিজের ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে আগামী দিনের সংবাদপত্রে তার প্রশংসাগুলো কি-ভাবে লেখা হবে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।

দেবেশ ইজিপ্ট থেকে কবে ফিরে এল, খোঁজ রাখবার দরকার হয়নি ওর। কিন্তু সেদিন দেখলো, দেবেশের পাঠকক্ষে আলো জ্বলছে। বড় বড় বই-এর স্তূপের আড়ালে পাঠরত লোকটি পড়ছে না ঘুমাচ্ছে, বুঝতে পারলো না উর্মিলা। চুলদাড়ি ভর্তি মুখখানার সামান্য অংশমাত্র দেখা যায়। উর্মিলা নিঃশব্দে উপরে চলে গেল—ভাবতে ভাবতে গেল, যদি স্বামী তার ঘরে আসেন তো দেখা যাবে।

দেবেশ কিন্তু এল না। উর্মিলাও নিখিল বঙ্গ সংস্কৃতি-সম্মেলনে যোগ দিতে প্রস্তুত হবার জন্য নতুন একটা রাগিণী অভ্যাস করতে আরম্ভ করলো ভোর না হতেই। দেবেশের সঙ্গে দেখা এখন তার না হওয়াই ভালো—কারণ, সোসাইটিতে ওর এখন যা 'পজিশ্যন,' তা বজায় রাখতে

ওকে ক্রমাগত চিন্তিত থাকতে হয়—বরের সঙ্গে প্রেমালাপের এখন সময় কোথায়? গভীর রাত্রিতে ক্লাবে সঙ্গীতাদি চর্চা শেষ করে বাড়ি ফিরে উর্মিলা সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় দেবেশের ঘরের দিকে একবার উঁকি দিয়ে যায়—যেন তপস্যারত যোগী একজন—চুলদাড়ি ভর্তি মুখখানা—রুক্ষ-চিন্তিত—চশমাআঁটা এক তাপসমূর্তিই দেখতে পায় সে। ভাবে—ওর তপস্যা শেষ হোক—উর্মিলা ততদিন বাইরের জগতে বিচরণ করেই কাটাবে। এমনি করেই মাস ছয় কাটলো।

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত কোন একটা সাপ্তাহিক আর্টপেপারে উর্মিলার একখানা রঙিন ছবি ছাপা হয়েছে। নীচে লেখা 'বাংলার কিন্নরকণ্ঠী গায়িকা উর্মিলা।' দিল্লীর একটা সভা থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে—যাবে উর্মিলা সেখানে যোগ দিতে। কলকাতার সভ্যসমাজ ওর নামের সঙ্গে এখন এত বেশী পরিচিত যে উর্মিলা দেবী না এলে তরুণরা তাকে গানের আসর বলতেই নারাজ! সিনেমার যে ছবিতে উর্মিলার গান থাকে তার সাফল্য সম্বন্ধে সংশয় থাকে না কারো—এমন যে উর্মিলা, তার সম্বন্ধে নানান খবর সংগ্রহ করার জন্য আগ্রহ সাধারণের হবেই, তাই ওর সম্বন্ধে নানান খবর সংগ্রহ করবার জন্য সকাল থেকে কাগজের রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফারের ভিড় লেগেই থাকে। অর্থাৎ উর্মিলার সারাদিন এবং রাত্রি পর্যন্ত কাজের চাপে ঠাসা। ক'টায় কোথায় ওর এনগেজমেণ্ট তাই লিখে রাখতেই ওর সেক্রেটারীকে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। দাদু দেখেন, আর ভাবেন বর্তমান যুগ এই রকম ব্যাপারেরই যুগ। কী তিনি করবেন! দেবেশের ডক্টরেট লাভের আশায় বসে থাকেন তিনি। আর দেবেশ থাকে পাঠকক্ষে সাধনারত।

উর্মিলার সঙ্গে পরিচয় না ঘটার জন্য দেবেশ তিলমাত্র দুঃখিত নয়, এমন কি কঠিন দর্শনতত্ত্বের চাপে বিয়ের কথা প্রায় মনেই পড়ে না—

চেষ্টা করে মনে করতে হয় যে তার বিয়ে হয়েছে। যখন মনে পড়ে তখন ভাবে—আর বেশী দেরী নেই—তার গবেষণা প্রায় শেষ হয়েছে, এখন দাখিল করতে পারলেই হয়।

বহুদিন বন্ধুবান্ধব এবং আমোদ-প্রমোদ থেকে বঞ্চিত রয়েছে দেবেশ। অথচ কলেজ জীবনে সে-ই সব থেকে উৎসাহী এবং আমুদে ছাত্র ছিল। সঙ্গীতেও যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছিল সে—কিন্তু দর্শনতত্ত্ব মাথায় ঢুকবার পর থেকে দেবেশ সব ছেড়েছে।

গবেষণা শেষ হোল—দাখিলও করলো দেবেশ এবং যথাকালে সসম্মানে ডক্টরেট উপাধিও লাভ করলো। এবার দেবেশ বধূর সঙ্গে আলাপাদি করবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়িতে ফিরবার পথে দেবেশ ভাবছিল—উর্মিলাকে একেবারে অবাক করে দেবে সে আজ। কিন্তু সর্বাগ্রে দাদুকে সুসংবাদটা জানানো দরকার। দাদু বাগানে পায়চারী করছিলেন, দেবেশ সটান এসে তাঁর পদপ্রান্তে প্রণাম করে জানালো যে ডক্টরেট উপাধি সে লাভ করেছে। দাদু মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। অতঃপর দেবেশ উর্মিলার কাছে যাবে।

কিন্তু কোথায় উর্মিলা! দেবেশ বাড়িখানার সর্বত্র ঘুরেও উর্মিলাকে দেখতে পেল না। বাড়ির কাউকে প্রশ্ন করতেও ওর লজ্জা করছে। তাহলে কি বাপের বাড়ি গেছে সে! দেবেশ চিন্তিতমুখে দাদুর কাছে ফিরে এসে আবার প্রশ্ন করলো—তোমার নাতবৌ কোথায় দাদু?

—তা তো জানিনে ভাই—দাদু ধীরে ধীরে বললেন। ইদানীং তার এনগেজমেন্টের সংখ্যা শতাধিক হয়ে উঠেছে। কোথায় এখন আছে, ওর হোম সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা কর।

—সেক্রেটারী? দেবেশ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ, দুজন আছে। একজন সঙ্গে যায়, আর একজন বাড়িতেই থাকে চিঠিপত্র বা ফোন অ্যাটেণ্ড করতে বা ভিজিটার এলে কথা বলবার জন্য। ওর খাস কামরার পাশের ঘরে খবর নাও গে।

—এসব কি কথা দাদু? ভিজিটার! সেক্রেটারী—খাস্-কামরা! কী ব্যাপার?

—ব্যাপার এমন কিছু নয়। যুগের হাওয়া—দাদু বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন—বর্তমান প্রগতিবাদেব পরিণাম! নাত্‌বৌ এখন সোসাইটির জুয়েল একটা।

—তুমি এসব তাকে কেন করতে দিলে দাদু? একী কাণ্ড!

—আমি কি করবো! আমার মত একটা বুড়োর সঙ্গে কি ঐ রকম একটা অসাধারণ মেয়ে বসে বসে জাবর কাটবে? দাদু বেশ কঠিন কণ্ঠেই বললেন।

—তাহলে!

—তাহলে যা হয় করগে। নিজের সোমত্ত বৌকে নিজে না দেখে যে দর্শনের গভীর তত্ত্ব নিয়ে পড়ে থাকে, তার বরাতে ঐরকমই হয়। সে এখন বারমুখো হয়ে গেছে, পারো তো ফিরিয়ে আনো। আমি কারো ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত দিই নে, তোমারও না, তারও না।

—সে তোমার ঘরের লক্ষ্মী দাদু—সে আমার বিয়ে-করা বৌ।

—হ্যাঁ, কিন্তু স্বামীর কর্তব্য তুমি পালন করনি। তোমার ত্রুটি। গবেষণা শেষ না করে বিয়ে তুমি না করলেই ভাল করতে। বলে দাদু আবার বললেন—যে বয়সের যা—ওকে আমি ঘরে কেমন করে আটকে রাখবো। শাশুড়ী থাকে, ননদ থাকে, তবু যা হোক তারা কিছু করে। আমি বুড়োমানুষ কি বলতে পারি! জোর করে অবশ্য তাকে আটকে রাখা যেত, কিন্তু জোর আমি করিনি—আর তুমি করবে, তাও আমি চাইনে। আমার মত ভালবাসার বন্ধনই বন্ধন—বিয়ের আইনকে আমি গৌণ বন্ধন মনে করি।

দাদুর কথার মতকে চিরদিনই শ্রদ্ধা করে দেবেশ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—বেশ দাদু, তাই হবে। যদি ভালবাসা দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি তো আনবো, নাহলে সে তার ইচ্ছামত পথ বেছে নেবে।

—হ্যাঁ, আমি তাই চাই।

দেবেশ এরপর আর কোন কথা না বলে উর্মিলার খাসকামরার পাশের ঘরে এসে ওর সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করলো—উর্মিলা কোথায় গেছে এখন?

সেক্রেটারী আগে ঘড়ি দেখে একখানা খাতা খুলে বললে, পাঁচটা থেকে ছটা উনি থাকবেন বঙ্গ-সংস্কৃতি সংসদে—এখনো সেখানেই আছেন—তারপর···একটু অপেক্ষা করুন স্যার—এ খাতাটা ফুরিয়ে গেছে—বলে অন্য একখানা নতুন খানা খুলে দেখে বলল,—ছয়টা কুড়ি মিনিটে পৌছবেন লেক ক্লাবে—সেখান থেকে জাস্ট সেভেন—ঠিক সাতটায় উঠবেন—তারপর যাবেন ব্রিজ কমপিটিশ্যান—যদি সেখানে না যান তবে ফোন করে জানাবেন—এবং খাতাটার আরো একপাতা উল্টে সেক্রেটারী বলল—ভারত-নাট্যমন্দির—আটটা থেকে এগারটা।

—থাক। ঐ ভারত-নাট্যমন্দিরের ঠিকানাটা বলুন তো—

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে দেবেশ বের হয়ে গেল।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ওকে,—ভাবছিল দেবেশ। স্বামীর কর্তব্য সে যথারীতি পালন করে নি। নিজের সৎখেয়াল নিয়ে আত্মান্নতির জন্য যাই সে করুক, নববিবাহিতা বধূর দিকেও নজর দেওয়া তার উচিৎ ছিল। তার নৈতিক কর্তব্যে ত্রুটি হয়েছে। উর্মিলা স্বামীসঙ্গ না পাওয়ার জন্যই বহির্মুখী হতে বাধ্য হয়েছে—কারণ, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা কোনো মেয়ে বেকার বসে থাকতে পারে না, এক বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গীতচর্চ্চা করেও সময় কাটাতে পারে না। উর্মিলা যে ভাবে সোসাইটিতে মিশেছে, তার জন্য সমস্ত দায়িত্ব আজ দেবেশের স্কন্ধেই পড়েছে এসে। উর্মিলা যদি এর মধ্যে নষ্টও হয়ে গিয়ে থাকে, তবুও দেবেশ তাকে দোষ দিতে পারবেনা—কারণ দেবেশ স্বামীর কর্তব্য করে নি। হয়তো এখনো উর্মিলা নষ্ট হয়ে যায় নি—এখনো

সময় আছে তাকে ফেরাবার—ভাবতে ভাবতে দেবেশ ভারত-নাট্য মন্দিরের দরজায় এসে উপস্থিত হোল।

বাইরে থেকেই ওখানকার ব্যাপারটা দেখতে চাইল দেবেশ। দেখলো—একটা বড় ঘরে বহু যুবক যুবতী। নানা কথাই বলাবলি চলছে। কয়েকটা কথা শুনেই দেবেশ বুঝতে পারলো—আগামী দোলপূর্ণিমায় এখানে একটি নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হবে, তারই পাত্র-পাত্রী নির্বাচন চলেছে এবং অসুবিধা হয়েছে নায়কের; এমন নায়ক চাই, যিনি ভালো অভিনয় তো করবেনই, ভাল গাইতেও সমর্থ হবেন —তাছাড়া কিঞ্চিৎ নৃত্যজ্ঞানও থাকা দরকার তাঁর।

সবগুলো গুণ একজন যুবকের মধ্যে পাওয়া সহজ নয়, তাই ওরা বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। উর্মিলাই নায়িকা—'রাজকুমারী চিত্রলেখা' —তিনি নৃত্যগীত-পটিয়সী এবং চিত্রাঙ্কণবিদ্যায় সুদক্ষা—তাছাড়া তিনি অসাধারণ সুন্দরী। তাই পণ করেছেন, যিনি তাঁকে সব রকমে পরাস্ত করতে পারবেন, তাঁকেই বরমাল্য দান করবেন।

দেবেশ গোপনে থেকে যতটা সম্ভব ব্যাপারটা বুঝেই বেরিয়ে এল ওখান থেকে এবং একখানা ট্যাক্সি করে সটান ঢুকলো এক ভাল মেক-আপ-ম্যানের দোকানে। সজ্জাকরকে বললো—আমার চুলদাড়ি সব কেটে ছেঁটে এমন করে সাজাতে হবে, যাতে আমার এই বর্তমান চেহারার সঙ্গে কোনো মিল না থাকে—আবার কৃত্রিম চুলদাড়ি দিয়ে আমাকে মেক-আপ করতে হবে—হুবহু যেন আমার এই চেহারাই ফিরে আসে—বল—পারবে?

সজ্জাকর সুদক্ষ মেক-আপ-ম্যান। সে খানিকক্ষণ দেবেশকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে বলল—হ্যাঁ ঠিক হবে। এই রকম চুলদাড়ি আছে আমার। তবে খরচ বেশী পড়বে স্যার।

—কত? দেবেশ প্রশ্ন করলো।

—প্রতিবারের জন্য পনের টাকা করে।

—বেশ, দশবারের জন্যে তোমাকে দেড়শ টাকা দিচ্ছি—দরকার হলে আরো দেব। বলে দেবেশ বসে গেল মেক-আপ করতে।

ঘণ্টাখানেক পরে সে যখন মেক-আপ করে দোকান থেকে বেরুল, তখন তাকে আর চেনা যায় না—সুন্দর সুমার্জিত এক ধনীপুত্র—দেবেশের ঠাকুরদাও হয়তো চিনতে ইতস্ততঃ করবেন। দেবেশ একখানা ট্যাক্সি ডেকে সটান চলে এল ক্লাবে। এসেই মেম্বর হোল সেখানকার—নাম লেখালো—চন্দ্রচূড় রায় চৌধুরী—বাড়ি বিষ্ণুপুর—জিলা বাঁকুড়া—সম্প্রতি বিলেত থেকে ফিরেছে। থাকে কলকাতার বিখ্যাত এক হোটেলে।

ভর্তি হওয়ার কার্ডখানা নিয়ে দেবেশ সটান এসে ঢুকলো—যে ঘরে নৃত্যনাট্য পরিকল্পনার জল্পনা-কল্পনা চলছে। অসাধারণ সুন্দর দেখে সকলেই তাকালো ওর দিকে। উর্মিলার মনে হোল—কে এই ভদ্রলোক। যেন চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু উর্মিলা তখুনি ভাবলো,—না চেনা নয়—লোকটার কপালের সঙ্গে তার স্বামীর কপালের কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য আছে, তাই এমন মনে হচ্ছে।

—আপনি কি নতুন মেম্বার হয়েছেন?—প্রশ্ন করলেন একজন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—অকস্মাৎ এই ঘরে আসার জন্য মাফ চাইছি। কিন্তু আমি অভিনয় ব্যাপারে খুব বেশী ইনটারেস্টেড—তাই সর্বাগ্রে এখানেই এলাম—বলে দেবেশ হাতযোড় করে নমস্কার করলো।

—বেশ—বেশ—বসুন—অভিনয় কি আগে করেছেন আপনি?

—হ্যাঁ—অনেক—অবশ্য এমেচার হয়েই—বলে দেবেশ কিঞ্চিৎ হাসল।

—গাইতে পারেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমাদের বংশটাই গাইয়ের—বাড়ি আমার বিষ্ণুপুর।

—তাহলে—বলে সেক্রেটারী স্বয়ং এগিয়ে এসে বললেন—আপনি কি আমাদের নৃত্যনাট্যে 'কুমার বজ্রবর্ধন' হতে পারবেন?

—যদি অবশ্য আপনারা অনুগ্রহ করে সে সুযোগ দেন তো চেষ্টা করবো।

তৎক্ষণাৎ ওকে পরীক্ষা করলেন সকলে। দেবেশ একটা উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত গাইল—নৃত্য সম্বন্ধে সমালোচনা করল এবং চিত্রাঙ্কণ বিদ্যাতেও তার নৈপুণ্য প্রমাণ করল। অতঃপর উর্মিলার সঙ্গে কয়েকটা কথা বই থেকে পড়ে অভিনয় করে সে প্রমাণ করে দিল যে সে সু-অভিনেতা। ঠিক হয়ে গেল চন্দ্রচূড় চৌধুরী হবেন রাজকুমার বজ্রবর্ধন।

উর্মিলা আনন্দিত হচ্ছে এমন একজন অভিনয়-সঙ্গী পেয়ে।

মিঃ চৌধুরী বিশেষ কাজ আছে বলে প্রস্থান করলেন হোটেলে ; আগামী পরশু পার্ট মুখস্থ করে আবার আসবেন—জানিয়ে গেলেন। উর্মিলা ওখান থেকে অন্য একটা এনগেজমেণ্ট সেরে বাড়ি ফিরে দেখলো স্বামী দেবেশ যথারীতি বই-এর স্তূপ সামনে রেখে পড়ছে। চুলদাড়িতে মুখখানা ভর্তি—রংটাও বেশী কালোমত যেন।

চন্দ্রচূড় চৌধুরী একটা অসাধারণ ব্যক্তি। ক্লাবে আসার পর থেকে দিন চার পাঁচের মধ্যে সে প্রমাণ করে দিল যে সেই এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ। রূপ তার অতুলনীয়। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সে খুবই ভাল গায়, আবার আধুনিক গান-বাজনাতেও যথেষ্ট কৃতিত্ব তার—তাছাড়া অভিনয়-নৈপুণ্য অসাধারণ। লোকটার বিদ্যা কত, কেউ জানে না কিন্তু তার প্রত্যেকটি কথা স্বাধীন এবং সুস্পষ্ট চিন্তায় উজ্জ্বল। এরকম একজন সভ্য পেয়ে ক্লাবের মেম্বারগণ খুবই খুসী হয়েছেন, বিশেষত নারী মেম্বারগণ ; কারণ মিঃ চন্দ্রচূড় এখনো অবিবাহিত। আর কুমারী সভ্যার সংখ্যা এখানে অনেক বেশী। হলে কি হবে—চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে অভিনয় করবে নায়িকা উর্মিলা রাজকুমারী চিত্রলেখা হয়ে, সুতরাং উর্মিলার সঙ্গেই তার বেশী মেলামেশা হবার কথা—কিন্তু হচ্ছে না। সবাই লক্ষ্য করে—চন্দ্রচূড় রিহার্সালের দু'এক মিনিট পূর্বে এসে যোগদান করে এবং নিজের অভিনয়টি শেষ হবার ফাঁকে ফাঁকে অন্যত্র চলে যায়—যেখানে ক্যারাম বা টেবিল-টেনিস চলছে—অথবা বৈঠকী গান হচ্ছে। উর্মিলার সঙ্গে বাজে কথা সে প্রায় বলেই না।

উর্মিলা বিবাহিতা—সবাই জানে। শহরের বিশেষ ধনী ও বিদ্যান ডঃ দেবেশের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে—স্বামী তার বিখ্যাত দার্শনিক দেশবিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান; নাম তাঁর খবরের কাগজে ছাপা হয়—সবাই দেখেছে।

এহেন উর্মিলার সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠতার কোনো মূল্য নেই—ভেবেই হয়তো মিঃ চন্দ্রচূড় ওর সঙ্গে বেশী মেলামেশা করে না—এই ধারণাই বদ্ধমূল রয়েছে সকলের মনে। কিন্তু উর্মিলার এজন্য যথেষ্ট আক্ষেপ জাগে অন্তরে। তার সঙ্গ-পিপাসু নারীমন সুদর্শন চন্দ্রচূড়ের সান্নিধ্য লাভ করতে চায় কিছু অধিক পরিমাণে। কারণ মিঃ চন্দ্রচূড় অভিনয়ের নায়ক এবং উর্মিলাকে তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে হচ্ছে। কিন্তু রিহার্সাল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ চন্দ্রচূড় চলে যায় ক্লাব থেকে। অন্য কথা কইবার অবসর মাত্র দেয় না উর্মিলাকে। এমন কি অভিনয় সম্বন্ধে কোনো আলোচনাও করে না।

উর্মিলার বহুবার মনে হয়েছে—মিঃ চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে তার স্বামীর চেহারার বিশেষ সাদৃশ্য আছে—কিন্তু কোথায় সাদৃশ্য, ও ঠিক ধরতে পারে না। রিহার্সাল শেষ করেই তাড়াতাড়ি দু'একদিন বাড়ি ফিরে দেখেছে, স্বামী তার যথারীতি পাঠকক্ষে ধ্যানমগ্ন—সামনে বই এর স্তূপ।

চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে রিহার্সাল শেষ করে সেদিনও রাত্রে ফিরে ঝির কাছে শুনলো—দেবেশ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে গেছে আজ সন্ধ্যার ট্রেনে।

স্বামীর প্রায়শঃ অনুপস্থিত সহ্য হয়ে গেছে উর্মিলার—আর যে স্বামীর সঙ্গে আলাপই হয় নি—তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে কাই-বা যায় আসে। লক্ষ্ণৌ থেকে কবে স্বামী ফিরবেন—জানবার ইচ্ছাও হোল না। উর্মিলা প্রকাণ্ড আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভাল করে দেখলো, ক্লাবের রিহার্সালে বলা প্রেমের কথাগুলো আর একবার বলল—চমৎকার হচ্ছে। যথেষ্ট প্রশংসা পাবে সে এই অভিনয়ে। কিন্তু তবু ওর মনে হচ্ছে ওর অভিনয়টা চন্দ্রচূড়ের অভিনয়ের

কাছে কিছুই নয়। কী আশ্চর্য অভিনয় করে চন্দ্রচূড়! অভিনয় করে—নাকি সত্যি ভালবাসা জানায় উর্মিলাকে? এতো বাস্তব, এতো সত্য সে অভিনয়, যে রিহার্সাল দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায় —এমন কি উর্মিলাও। কিন্তু উর্মিলা তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করলো। মুগ্ধ তার হাওয়া চলে না। সে বিবাহিতা, তার স্বামী বর্তমান। কিন্তু মানুষের মন কোথায় কি ভাবে বাঁধা পড়ে, কারো জানা নাই! উর্মিলাও জানে না—কেমন করে সে ধীরে ধীরে ঐ অসামান্য গুণী অভিনেতা চন্দ্রচূড়ের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে।

উর্মিলা তার মনের সুপ্ত চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে বেশবাস খুলে বিছানায় শুলো। এবার ঘুমুবে। কিন্তু ঘুম আসছে না। ভাবছে। লক্ষ্ণৌ গেল—দিল্লী, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ ঘুরে বেড়ায়। বিয়ে করা বৌ-এর সঙ্গে একবার একটু আলাপ করবারও অবসর হয় না। চমৎকার মানুষ কিন্তু দেবেশ। বিয়ে করবার কি দরকার ছিল।

কিন্তু তখনি মনে পড়লো বিয়ে দেবেশ স্বেচ্ছায় করে নি। তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে কি দেবেশ তাকে পছন্দই করে নি? কে জানে!

স্বামীকে ভাল করে দেখাই হয়ে ওঠে নি—আর দেখবে কি, চুল আর দাড়ি—সামনে পুঁথীর গাদা—চোখে আবার মস্ত চশমা পরে কেন? আগে তো পরতো না।—চন্দ্রচূড় চশমা পরে না—আয়ত সুন্দর চোখ দুটি কেমন দেখা যায়—দেবেশের চোখই দেখতে পায় না উর্মিলা! চন্দ্রচূড় দারুণ সিগারেট খায়, দেবেশ কৈ সিগারেট খায় না তো! চন্দ্রচূড় কী চমৎকার বেহালা বাজায়, আর দেবেশ এত বড় গাইয়ে ঠাকুরদার নাতি হয়েও গানবাজনা কিছু শিখলো না!

তবু কোথায় যেন একটা সামঞ্জস্য আছে চন্দ্রচূড় আর দেবেশের চেহারায়। কী সে সামঞ্জস্য? ভেবে ভেবে উর্মিলা ঠিক করলো—স্বামীকে চন্দ্রচূড়ের মত করে পেতে চায় বলেই হয়তো তার কল্পনায়

দেবেশের সঙ্গে চেহারার মিল আছে, মনে হচ্ছে তার। না—মিল নেই। থাকা সম্ভব নয়—দেবেশ দার্শনিক, আর চন্দ্রচূড় চারুকলার পূজারী, দেবেশ মেয়েদের সঙ্গে কথাই বলে না, চন্দ্রচূড় যেন নারী বশীকরণের মন্ত্র জানে। ঘুমিয়ে গেল উর্মিলা।

পরদিন উর্মিলা ক্লাবে যেতে পারলো না—বাপের বাড়ি গেল। তার দিদির ছেলের 'ভাত'। দেবেশেরও যাবার কথা ছিল। কিন্তু সে শহরের বাইরে। উর্মিলাকে দিদি, মা নানা প্রশ্ন করলেন শ্বশুরবাড়ী এবং স্বামী সম্বন্ধে। বন্ধুরা তার স্বামীসৌভাগ্য লাভে আনন্দ প্রকাশ করলো। ভালবাসা কেমন জমেছে প্রশ্নও করলো ; উর্মিলা মিথ্যা সত্যি নানা রকম বলে জবাব দিল তাদের।

কোনরকমে দিনরাত্রিটা কাটিয়ে উর্মিলা শ্বশুরবাড়ী চলে এল। কারণ এখানে থাকলে তার ক্লাবে যাওয়া হবে না। ক্লাবে রিহার্সাল বন্ধ হয়ে যাবে—কিন্তু উর্মিলা নিজের অন্তরে অনুভব করছে, রিহার্সালের জন্য নয়, মিঃ চন্দ্রচূড়ের সান্নিধ্যের জন্যই মনটা ব্যাকুল ওর।

শ্বশুরবাড়ী এসেই ঝিকে প্রশ্ন করে জানলো দেবেশ ফেরে নি—কবে ফিরবে, ঠিক নেই। সন্ধ্যায় যথারীতি সাজগোজ করে ক্লাবে গেল উর্মিলা।

মিঃ চন্দ্রচূড় বেহালা বাজাচ্ছে। সুরের এক অনুপম ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করছে সে। মুগ্ধ হয়ে শুনছে কয়েকজন। উর্মিলা নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালো একধারে। শুনতে লাগলো।

বাজনা শেষ করে চন্দ্রচূড় এদিকে ফিরে নমস্কার জানালো উর্মিলাকে। একটু কাছে এসে প্রশ্ন করলো।

—শরীর ভালো তো ? কাল আসেন নি যে !

ওর কথার সুরে অপরূপ একটা স্নেহপ্রেমের আমেজ, তার সঙ্গে যেন অভিমানও। উর্মিলা মৃদু হেসে বলল,—কাল আমার দিদির ছেলের অন্নপ্রাশন ছিল।

—ওঃ ! কৈ আপনার স্বামীকে তো কোন দিন এখানে আনলেন না !

—তান পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন; এ সবে যোগ দেন না।

—শুনলাম তিনি বিখ্যাত ব্যক্তি। আমার সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দেবেন।

—দেব—বলে উর্মিলা একটু থেমে হেসে বললে—উনি দর্শনের পণ্ডিত। ওঁর সঙ্গে কেন আলাপ করতে চান আপনি?

—ওঁকে বুঝিয়ে দেব যে দর্শন মানে পড়া নয়—দেখা। উনি এখনো দেখতে শেখেন নি—নইলে আপনাকে ছেড়ে পুঁথি দেখবেন কেন!

রূপের প্রশংসা উর্মিলা বিস্তর শুনেছে, কিন্তু চন্দ্রচূড়ের কথাগুলো আজ ওকে বেশী মুগ্ধ করলো। তবু নিজেকে সামলে হেসেই বলল সে —পুঁথির মধ্যে তিনি হয়তো মহত্তর কিছু দেখতে পান—

—মহৎ হলেই সব সময় মনোরম হয় না উর্মিলা দেবী। তৃষ্ণার সময় জল না পেলে গাছে চড়ে ডাব পেড়ে খাওয়ার চেয়ে ক্ষেতের কচি শশা তুলে খাওয়া আরামের।

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট হয়ে আসছে। উর্মিলা লজ্জায় লাল হোল না। ভালই লাগছে ওর। চুপ করে রইল।

চন্দ্রচূড় বলল—তাছাড়া ক্ষেতের শশা আর গাছের ডাব দুটোই যার আছে—সে আগে ক্ষেতের শশাকেই দেখবে—

—কারণ, শশা ডাবের চেয়ে আরো ক্ষণস্থায়ী কেমন? বলে হাসলো উর্মিলা।

—ঠিক কথা। ডাব বুড়োলে নারকেল হয়—শশা বুড়োলে পচে যায়। বুদ্ধিমানরা আগে শশাটা খেয়ে তবে ডাব খেতে যাবে। চলুন রিহার্সালে যাওয়া যাক....

—চলুন—বলে যেতে যেতে উর্মিলা বলল—আমাকে কি আপনি শশার সঙ্গে তুলনা করলেন?

—শশা নয়, শশাঙ্ক—চাঁদ—বলে মধুর হাসলো চন্দ্রচূড়; আবার বলল,—মাথায় থাকে।

রিহার্সাল ঘরে যথারীতি অভিনয় করলো দুজনায়, কিন্তু অনন্যা সমস্তক্ষণ ভাবছে—চন্দ্রচূড় আজ তার সঙ্গে অনেক কথা বলেছে,—যে কথা ব্যক্তিগত—যার সঙ্গে অভিনয়ের কোনো যোগ নেই। খুবই ভাল লেগেছে কথাগুলো ; কিন্তু চন্দ্রচূড় ঐ কথার মধ্যে কি জানালো ? জানালো যে উর্মিলাকে সে ভালবাসে। বলেই তো দিল—চন্দ্রচূড় অর্থাৎ শিবের মাথায় চাঁদ থাকে। কেমন চমৎকার কৌশলে কথা বলে চন্দ্রচূড়! এর কাছে কোথায় লাগে দর্শনের কথা কাটাকাটি, তর্ক আর বিতর্ক! চন্দ্রচূড় সত্যি অসাধারণ।

রিহার্সাল শেষে চন্দ্রচূড় চলে যাচ্ছে—উর্মিলা তার সঙ্গে ক্লাবের গেট অবধি এল কথা বলতে বলতে। চন্দ্রচূড় বলল,—আসছে শনিবার তো অভিনয়! তারপর ?

—কি তারপর ? উর্মিলা প্রশ্ন করলো।

—তারপর আর দেখা হবে না তোমার সঙ্গে।

—কেন ? আপনি কি কোথাও যাবেন ? উর্মিলার স্বরে ব্যাকুলতা।

—না ; কিন্তু থেকেই বা কি করবো এখানে। আর তো আমার কোনো চার্ম নেই।

উর্মিলা চুপ করে রইল। চন্দ্রচূড় তার দিকে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, সে জানে না—কিন্তু নিজে সে বহুদূর গিয়ে পড়েছে, তা অনুভব করলো এই প্রথম। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে চন্দ্রচূড় বলল—আমি আসার আগে বিয়ে না করলেই কি চলতো না মিলা ?

উর্মিলা জানাতে চাইল, 'কে জানতো তুমি আসবে'—কিন্তু আশ্চর্য—কিছুই সে বলল না—অন্য দিকে চেয়ে রইল।

—আমার কথা কি অভদ্র শোনাচ্ছে মিলা। প্রশ্ন করলো চন্দ্রচূড়।

—না—তা কেন ? হাসলো উর্মিলা। বলল,—আমি বিবাহিতা।

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি স্বামী বঞ্চিতা। যে তোমাকে প্রেম দিয়ে জয় করতে চায়নি তার সাত-পাকের বাঁধনে কি তুমি বন্দী হবে ? তোমার

স্বাধীন স্বত্তা কি কয়েকটা আচার-অনুষ্ঠানেই বিক্রী হবে মিলা? অন্তরের বিয়ে যার সঙ্গে হোল না—বাইরের বিয়েতে তোমাকে পাবার তার কী অধিকার?

—উর্মিলা চুপ করে রইল। চন্দ্রচূড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে তাকে। বলল,—শোন মিলা, আমি যথাসময়ে আসতে পারি নি বলে তোমাকে হারাব, এ দুঃখ আমার সহ্য হবে না—তোমার যদি সম্মতি পাই তো তোমাকে বুকে নিয়ে আমি দূর কোনো দেশে চলে যাব—তুমি ভেবে আমায় জানিও।

একবার শুধু চাইল চন্দ্রচূড় ওর চোখের পানে। চন্দ্রালোকিত রজনীতে সেই প্রেমভরা দৃষ্টি সর্বাঙ্গে যেন আলিঙ্গন করলো উর্মিলার। চলে গেল চন্দ্রচূড়। উর্মিলাও কিছু পরে বাড়ি এসে শুনলো, দেবেশ আজও আসে নি। চার-পাঁচ দিন পরে আসবে। চন্দ্রচূড়ের আকস্মিক প্রেম নিবেদন অভিভূত করে দিয়েছে উর্মিলাকে। বিছানায় শুয়ে অগাধ চিন্তায় ডুবে গেল উর্মিলা।

দেবেশ একটা চৌকিতে শুয়ে ভাবছে আকাশপাতাল। স্থান মধ্য কলকাতার একটা মধ্যবিত্ত হোটেল—রাত দুটো বাজে। চোখে ঘুম নেই দেবেশের। দর্শনের জটিল তত্ত্ব কোনো কাজে লাগছে না আজ ওর। মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানও অকেজো বোধ হচ্ছে—সর্বাঙ্গ জ্বালা করছে, যাকে বলে বৃশ্চিকদংশন!

উর্মিলা চন্দ্রচূড়ের প্রেমে পড়েছে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; কিন্তু উর্মিলা চন্দ্রচূড়ের কাছে পরস্ত্রী—বিবাহিতা নারী সে। অথচ···আর ভাবতে পারছেনা দেবেশ। এই নারী; এই তার সতীনিষ্ঠা? এতো ভঙ্গুর? হতে পারে, দেবেশ উর্মিলার প্রতি ঔদাসিন্য দেখিয়েছে—বিবাহিতা বধূকে যথাযোগ্য সঙ্গ দেয়নি—কিন্তু তার জন্য কি কোনো বিবাহিতা তরুণী অপর পুরুষকে ভালবাসবে! বিয়ের মন্ত্রগুলোর কি কোনোই শক্তি নেই? কোনই ক্ষমতা নেই আজন্ম অর্জিত

ভারতীয় সংস্কারের? সীতা-সাবিত্রী-বেহুলার চরিত্র গৌরবের। দূর করো।

কিন্তু ভেবে কোনো লাভ নেই। বেশ বোঝা গেছে, চন্দ্রচূড় অতি অনায়াসেই উর্মিলার মন-প্রাণ হরণ করতে সমর্থ হয়েছে। এতো সহজে যে দেবেশ কল্পনাও করেনি কোনদিন এমন ঘটবে। কিন্তু ঘটলো।

ঐ বৌকে নিয়ে দেবেশ করবে কি? অন্যাসক্তা নারীকে আশ্রয় করে সংসার-জীবন যাপন করা কি সম্ভব হবে তার পক্ষে? যদিও দেবেশ স্বয়ং চন্দ্রচূড়—তবু উর্মিলা তো জানেনা সে কথা। সে জানে চন্দ্রচূড় অন্য ব্যক্তি। তার বাড়ি বিষ্ণুপুর; সে সঙ্গীতজ্ঞ এবং সু-অভিনেতা—আর দেবেশ প্রখ্যাতনামা দার্শনিক। সে এখন লক্ষ্ণৌএ আছে।

সাত পাকের বৌ-এর সঙ্গে প্রেম করতে এসে দেবেশ এ কী বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেললো তার জীবনে? তার বর্তমান যুগোচিত চিন্তাধারায় সে অনুভব করেছিল বিয়ের মন্ত্র—আচার অনুষ্ঠান এবং সামাজিক বিধিনিষেধই কোনো নারীকে সম্যক্ অধিকারের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাকে প্রেম দিয়ে আপনার করে নিতে হবে। তাই প্রেমের বন্ধনে উর্মিলাকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল দেবেশ। কিন্তু এখন যে অঘটনটা ঘটেছে, তাকে দেবেশ সামলাবে কি করে?

উর্মিলা এখন দেবেশের চোখে চরিত্রহীনা ছাড়া কিছু নয়—কারণ বিবাহিতা উর্মিলা চন্দ্রচূড়রূপী একজন অভিনেতাকে ভালবাসছে—গভীর ভাবেই ভালবাসছে; এমন কি চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে দেশত্যাগ করে যেতেও হয়তো সে আপত্তি করবে না।—দেখা যাক। কিন্তু তার পর?

দেবেশ চিন্তায় ক্লান্ত হয়ে উঠলো—সিগারেট ধরালো।

জানলার পাশে দাঁড়িয়ে নিস্তব্ধ নগরীর পানে চেয়ে বলল—চন্দ্রচূড়কে না ভালবাসলেই ভাল করতে উর্মিলা।

কিন্তু দেবেশ অনুভব করলো—এই অল্পদিনেই উর্মিলাকেও সে নিজে কম ভালবাসেনি। অবিরাম তার কথা ভেবেছে—অহরহ চিন্তা

করেছে নায়িকা রাজকুমারী চিত্রাকে নয়—তার প্রিয়তমা উর্মিলাকেই।

উর্মিলা যে অসামান্যা এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই—কিন্তু উর্মিলা আজ আর বধূরূপে থাকার যোগ্য নয়। ওকে নিয়ে আর ঘর করা যায় না। ওর বহির্মুখী নারীমন এখন চন্দ্রচূড়ের পিছনে ছুটছে দেশে-বিদেশে সমাজের গণ্ডী পার হয়ে—সৈরিনীর ভ্রষ্টাচারিতায়।

উর্মিলাকে হারালো দেবেশ।

মুখখানা কালো হয়ে উঠছে ওর। চোখে জল দিয়ে আবার শুলো। ঠিক করলো, অভিনয় শেষ হওয়া পর্যন্ত সে দেখবে—কতদূর যায় উর্মিলা। কতখানি ঘটে তার অধঃপতন।

পরদিন থেকে অভিনয়ের পূর্বে এবং পরে উর্মিলার সঙ্গে আলাপের সময় কিছু বাড়িয়ে দিল চন্দ্রচূড়। বেশ প্রকাশ্যেই বসে গিয়ে ওরা ঝিলের ধারে। অপর সকলে ভাবে, অভিনয়ের আলাপ করছে। ঈর্ষাও হয় অনেকের। চন্দ্রচূড় গ্রাহ্য করে না। সেদিন বলল—কাল তো আমাদের অভিনয়—তারপর কি তোমার আর দেখা পাব না মিলা?

—তা কেন? আমি তো ক্লাবে আসবোই। আর আমার বাড়িতে—

—না, বাড়িতে তোমার স্বামী আছে; ওখানে আমি যেতে চাইনে।

—সে খুব নিরীহ গোবেচারা—পড়াশুনো নিয়েই থাকে।

—তাকে পণ্ডিত-মূর্খ বলছো? চন্দ্রচূড় তাকালো উর্মিলার পানে।

—না না—মূর্খ বলবো কেন? আমার পানে চাইবার তার অবসর নেই। উর্মিলা দীর্ঘশ্বাস ফেললো একটা।

—এভাবে দিন কাটবে কি করে উর্মিলা?

—কি করবো?

—চল, কাল অভিনয় শেষ করেই চলে যাব আমরা দূর কোনো

দেশে—ট্রেনে নয়—আমার চুস।চাগে—ঃ।
যাবে মিলা ?

চুপ করে রইল উর্মিলা। নিঃশব্দে কাটলো কিছুক্ষণ।

—তোমার স্বামী এখন কোথায়—বাড়িতে ?

—না—তিনি লক্ষ্ণৌ-এ আছেন।

—তা হলে ত সুবর্ণ সুযোগ—বলতে বলতে উর্মিলার হাতখানা ধরলো চন্দ্রচূড়—আবেগভরে বললে—প্রেমের দেবতা আমাদের এই সুযোগ দিচ্ছেন মিলা, তোমার জীবন এভাবে নষ্ট হতে দিতে চান না তিনি ; তুমি সম্মতি দাও।

উর্মিলা নিশ্চুপ বসে রয়েছে। চন্দ্রচূড় তেমনি আবেগমাখা কণ্ঠে বলল,—বিষ্ণুপুরের পাহাড় আর জঙ্গলে দেশে আমার বাড়ি উর্মিলা—তোমার স্বামীর কোনোদিন সাধ্য হবে না সেখানে যাবার। ওখানে গিয়ে আমি তোমাকে আমার গৃহলক্ষ্মীর মর্যাদাই দেব—তোমার আমার এই মিলন ঈশ্বরের বাঞ্ছিত। একটু থেমে আবার বলল—আমি জানি, আমাকে তুমি ভালবাস।

—এত তাড়াতাড়ি আমি কিছু বলতে পারবো না—উর্মিলা জবাব দিল।

—বেশ। কাল সারাদিন ভেবে সন্ধ্যায় আমাকে জানাবে। আমি তৈরীই আছি ; শুধু তোমার সম্মতির অপেক্ষা।

উর্মিলার হাতে চুমো দিয়ে চন্দ্রচূড় হোটেলে চলে গেল। আর উর্মিলা নিঃশব্দে ঘরে ফিরে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো—কি সে করবে। সত্যি কি চলে যাবে চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে ? চন্দ্রচূড়কে তো সে ভালবেসেছেই—কিন্তু চলে যাওয়া কি ঠিক হবে ?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন জেগে মাথাটায় গোলমাল বাধিয়ে দিচ্ছে। সমাজ, সংস্কার, সতীত্ব, নারীত্ব, প্রেম, তার মর্যাদা—সহস্র প্রশ্ন, কোন্‌টার মীমাংসা করবে উর্মিলা ? ক্লান্ত উর্মিলার ঘুম এল না।

পরদিন অভিনয় হোল—সবাই প্রশংসা করলো অভিনয়ের। ওর মধ্যে একফাঁকে চন্দ্রচূড় কয়েকটা কথা বলল উর্মিলাকে—আমি কাল থেকে ব্যগ্র হয়ে রয়েছি মিলা—চলো, আজই রাত্রে চলে যাই আমি ঠিক তিনটের সময় তোমার বাড়ির পিছনের দরজায় গাড়ি নিয়ে থাকবো—তিনটে হর্ণ দেব—তোমার খুব দরকারী জিনিষগুলো নিয়ে নেমে এসো। কেমন?

—আচ্ছা, বলল উর্মিলা।

দেবেশ চলে গেল।

উর্মিলা বাড়ি ফিরে এল।

* * * *

নিশুতি রাতে বাড়ি ফিরেই উর্মিলা দেখতে পেল, দেবেশের পড়ার ঘরে আলো জ্বলছে। তাহলে দেবেশ ফিরেছে নিশ্চয়ই! এতো রাত্রে বাড়ি ফেরার কথা জানানো, তার ওপর অভিনয়ের রং মাখা মুখ স্বামীকে দেখাতে ইচ্ছে নেই, তাই উর্মিলা পা টিপে টিপে ওপরে চলে এল।

ক্লাব থেকে আসার পথে সে চন্দ্রচূড়ের কথাই ভেবেছে—ভেবেছে বাড়ি ফিরে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটা বস্তু স্যুটকেশে ভরেই সে ঠিক তিনটার সময় নেমে চলে যাবে চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে। কিন্তু স্বামীর বাড়ি ফেরার সংবাদ ওর মনকে অত্যন্ত দমিয়ে দিল! এ যেন অঘটন।

কাপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি জিনিষগুলো গুছিয়ে নিল উর্মিলা, চলেই সে যাবে—এভাবে নিজেকে বঞ্চিত করে সে আর থাকতে চায় না। যে স্বামী বিয়ের পর একটা কথাও কোনো দিন বলল না, একবার আঙুল দিয়ে স্পর্শও করলো না, সে আবার স্বামী কিসের? উর্মিলার দেহমনের ওপর তার কোনো অধিকার নেই! না—নেই—নেই!

উর্মিলা নিজের মনেই বলল কথাগুলো জোর করে। ঘড়ি দেখলো। পনের মিনিট আছে তিনটে বাজতে। জানালা পানে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলো নিঃস্তব্ধ প্রকৃতি যেন ওর অভিসার সময়ের নির্দেশ দিচ্ছে নীরব ইঙ্গিতে। চলেই যাবে উর্মিলা- যা থাকে কপালে।

দশমিনিট বাকী আর—স্যুটকেশ হাতে নিয়ে বেরুচ্ছে উর্মিলা—বেরিয়েই যাবে। চন্দ্রচূড় তাকে ভালোবাসে—সত্যি ভালোবাসে। আজই অভিনয়ে রাজকুমারের ভূমিকায় তার ভালোবাসার কথাগুলো এতো বাস্তব, এত মর্মস্পর্শী হয়েছিল যে উর্মিলা বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। বেরুচ্ছে উর্মিলা।

পাঁচ মিনিট বাকী আর—ঠিক সেই সময়ে নীচে মোটরের হর্ণ শোনা গেল— পর পর তিনবার। এই সঙ্কেত—আর দেরী নয়—না। শোবার ঘরের বাইরে এসে আর একবার ঘরখানার পানে তাকালো উর্মিলা—বিরাট মেহগনী খাটখানায় ওর শয্যা পাতা—ও শয্যায় কোন দিন সে স্বামীর কাছে শোয়নি—ওর মাথার দিকে চমৎকার কাঠের কাজকরা ছবি—শিবকে আলিঙ্গন করে রয়েছেন পার্বতি—ঝলমল করে উঠলো ছবিটা উর্মিলার চোখে—উর্মিলা ফিরে এসে কাঠের খোদাই ছবিখানা দেখছে—

ঢং ঢং ঢং -তিনটে বাজলো। আর সময় নেই—উর্মিলা আবার এগিয়ে আসতে গিয়ে আবার ছবিখানা দেখলো—অকস্মাৎ ওর দুচোখে জল এসে গেল—বিবাহিতা উর্মিলা পর-পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাবে। যে হিন্দুনারীর পরম আদর্শ এই হরগৌরী—এই প্রেম-মহিমা।

না—উর্মিলা ছুঁড়ে ফেলে দিল স্যুটকেশখানা—তারপর লুটিয়ে পড়লো সেই কাঠের ছবিটার পায়ের তলায়। আশ্চর্য। উর্মিলার হোল কি!

দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ পড়ে রইলো উর্মিলা—তারপর ধীরে ধীরে উঠে বাইরে যাবার বেশ ত্যাগ করে সাধারণ একখানা শাড়ী পড়ে সটান চলে এল নীচে—ওর স্বামীর পাঠকক্ষে।

দেবেশ তখনো পড়ছে—শীতের রাত, প্রায় চারটা বাজে। দরজার দাঁড়িয়ে দেবেশকে দেখলো উর্মিলা—চুলদাড়িতে ভর্তি মুখ—কিন্তু সুন্দর—কী সৌম্য শান্ত জ্ঞানদীপ্ত ললাট। শিবোপম এই তপস্বীকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছিল উর্মিলা? কোন্ নরকে! নিজেকে কঠিন তিরস্কার করে উর্মিলা ভাবলো—স্বামী নিজের তপস্যায় নিরত, তাই উর্মিলার সঙ্গে বাহ্যিক ব্যবহার হয়ত কোরতে পারেন নি—কিন্তু উর্মিলাই বা কী করেছে?

উর্মিলা তো অনায়াসে নীচে এসে ওঁর সঙ্গ করতে পারতো, সেবা করতে পারতো। ওরই মধ্যে অবসর খুঁজে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে পারতো। উর্মিলা কি তার পত্নীর কর্তব্য করেছে ঠিক মত! না—কিছুই করে নি।

নিজেকে সম্বৃত করে উর্মিলা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দেবেশের কাছে, অত্যন্ত কাছে—লজ্জাকে ও তাড়িয়েছে, কিন্তু কথা ওর বেরুচ্ছে না। আবেগে উদ্বেগে কাঁপছে উর্মিলা। বই থেকে চোখ তুলে দেবেশ দেখলো, বলল—এসো, ঘরের মধ্যে এসো। কিছু বলবে কি উর্মিলা?

ওর মুখে মৃদু মধুর হাসি।

আমি—আমি একদিনও আপনার—আপনার খোঁজ নিইনি—আমি ভেসে যাচ্ছিলাম……!

—কোথায় ভেসে যাচ্ছিলে?—দেবেশ ওর বেপথু তনুলতা ত্বরিতে ধরলো।

—জাহান্নামে—বলতে বলতে উর্মিলা স্বামীর বুকে মুখখানা ডুবিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। দেবেশ নিঃশব্দে ওর পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলো—কী হয়েছে তোমার উর্মিলা—কোথাও কি আঘাত পেয়েছ?

—আমি তোমার বৌ—আমাকে তুমি ধরো, আমাকে আটকাও, বন্দী কর—আঘাত কর—আমি, আমি স্রোতের জলে কচুরীপানার মত ভেসে যাচ্ছি—আমাকে তুলে নাও!….

উর্মিলা অধীরা হয়ে স্বামীর বুকে কাঁপছে—আর দেবেশের চোখ

দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তবু সে প্রশ্ন করলো,—ব্যাপারটা কি বলবে তর্মিলা?

—বলবো—বলছি—একজনের প্রতি আমার মোহ এসে গিয়েছিল—আমি তার সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্য তৈরী হয়েছিলাম আজ।

—কৈ—গেলে না তো?—দেবেশের কণ্ঠে আনন্দের সঙ্গীত; আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যেতে পারবে না উর্মিলা—আমি জানি তুমি আমার—একান্ত আমার···

—আমি জানতাম না—বলে উর্মিলা তাকালো দেবেশের মুখপানে। আমাকে তুমি জানিয়ে দাও নি কেন?

—আমার অন্যায় হয়েছে উর্মিলা, আমার অপরাধ হয়েছে। তোমাকে এভাবে অবহেলা করার জন্য আমাকে তুমি দণ্ড দিতে পার—

—হ্যাঁ—দণ্ড দেব আমি! আমাকে সব থেকে ছিনিয়ে এনে তুমি একান্ত করে নিজের করে রাখ—

—বেশ তাই হবে! কিন্তু কার সঙ্গে তুমি পালিয়ে যাচ্ছিলে মিলা, কোন্ সে ভাগ্যবান—

—তার কথা আমি আর মনেও করতে চাই না—আর কারো কথা আমি কখনো মনে করবো না!

—তা কি হয় উর্মিলা? মনস্তত্ত্ব বলে—প্রথম প্রেম···

রাখো তোমার মনস্তত্ত্ব—উর্মিলা হুঙ্কার দিয়ে দেবেশের হাত ধরে টান দিয়ে বলল—এখনো ঘণ্টাখানেক রাত আছে। এসো, শোবে একটু।

উর্মিলা সটান টেনে নিয়ে গেল দেবেশকে নিজের ঘরে। স্যুটকেশটা উল্টে পড়ে আছে—দেখলো দেবেশ। খাটের গায়ে শিব-পার্বতির মূর্তিটা দেখিয়ে মিলা বললে—ইনি আমাকে আজ বাঁচিয়ে দিয়েছেন—

—ওঃ! এই খাটের গায়ের কাঠের মূর্তিটা!

—ও মূর্তি নয়—মূর্তিমান প্রেম! এসো—শোবে—

দেবেশ উর্মিলাকে দেখলো—ওর চোখে অতুলনীয় প্রেমবহ্নি যেন জ্বলছে। মুখখানা তুলে ধরলো উর্মিলার—তারপর ধীরে ধীরে বাঁ হাত দিয়ে নিজের দাড়িটা টেনে তুলে ফেললো। দেখছে উর্মিলা।

—অ্যাঁঃ! তুমি? চমকে উঠলো উর্মিলা।

—অভিনয় করছি না মিলা, সত্যি আমি।

—